

মোম-কাগজ

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী





মোম-কাগজ

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

মাফলারটা ভাল করে জড়িয়ে নিলেন কমল। আজ পৌষসংক্রান্তি। ঠাণ্ডায় রাতের কলকাতা কেমোর মতো গুটিয়ে রয়েছে। ঠান্ডা জিনিসটাকে একদম পছন্দ করেন না কমল। কেমন যেন আড়চোখে তাকানো একটা ঝড়।

মানুষের বেলাতেও একই নিয়ম মানেন কমল। আড়চোখে চাওয়া, মিউমিউ করা, কারণে-অকারণে হেঁ হেঁ করা মানুষ দেখলেই তফাতে থাকেন। মনে হয়, এদের শরীরে রক্তের বদলে বিষ বইছে।

১৫২। শারদীয়া দেশ। ১৪২২

পৌষের ঠাণ্ডাটাও ঠিক এমনই থান্ডাবাজ, ভিত্তি আর শয়তান। এমনপেতে সাহস বা প্রতিভা নেই, কিন্তু একটু আলগা গিলেই কী চেপে বসবে!

পল্লবনভলার এই ছোট ডিসপেনসারিটায় কমল একাই বসেন। তা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেল এখানে। কাঠের চেয়ার-টেবিল। কাঠের আলমারি। গদার মতো খটো পাখা। সব সেই প্রথম দিন থেকে আজও ওঁকে সার্ভিস দিয়ে চলছে। কমল বোঝেন, এগুলোও ওঁর সঙ্গেই যাবে।

সাইকেলটা নিয়ে আজ লোকের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করেছেন কমল। রাস্তার লেকে এখন প্রচুর আলো দেওয়া হয়েছে। পুলিশও ঘোরে। সিনেমা থেকে নাইট শো-র লোকবান্দো থাকে রাস্তায়। কিন্তু তারপর সেই অজ্ঞান পেরিয়ে ওঁর পাড়াতে ঢুকলেই সব কেমন যেন থিম মেয়ে যায়।

কমল সাইকেলের গতি বাড়ালেন। বিশেষ পেয়ে গিয়েছে। আজ বিকেলে এমন রোগীর চাপ ছিল যে, কিছুতেই খাওয়ার সময় পাননি। বাড়ির কাজের ছেলে বুড়াই, খাবার নিয়ে বসে থাকে ওঁর জন্য। বাচ্চা ছেলে। তাকে বড় ভালবাসেন কমল। নিজের তো আর বউ, বাচ্চা হল না, তাই বুড়াই এখন নিজের সন্তানের মতো হয়ে গিয়েছে।

ডিসপেনসারিতে মলয় বলে একটা ছেলের ওঁকে সাহায্য করে। মলয় বলে, 'দাদু, আপনি কেন এখনও এখানে পড়ে থাকেন। পাড়ায় তো বেশ বড় নার্সিং হোম করেছেন একটা। তা-ও সস্তায়ে দু'দিন একমাল আসেন কেন? এত ব্যয় হল, একটু বিশ্রাম নিন।'

কমল বিরক্ত হন। 'সিটিখিট করে বলুন, আসবে তার কী রে? জানিস না, এখান থেকেই আমার হাতেখড়ি। আমার যা হয়েছে তা এই ডিসপেনসারি থেকেই। আর এই গরিব মানুষগুলো যাবোঁ কোথায়? তাদের ওই হাজার টাকার ডাক্তারগুলোর কাছে?'

মলয় তা-ও ছাড়ে না। বলে, 'আপনি পাবেন বটে। চেনা নেই জানা নেই, তাদের জন্য এত করেন। রাস্তায় পড়ে থাকা মানুষকে তুলে নিয়ে গিয়ে হেল্প করেন, চিকিৎসা করেন। কিন্তু নিজের মিকে যত্ন নেই। গাড়ি তো কিনতে পারেন একটা। এই মাছাতা আলমের সাইকেলটা এবার ছাড়ুন।'

কমল আরও রেগে ওঠেন। বলেন, 'আমি গাড়ি কিনব কী? বুলডোজার, সেটা তুই বলবি? পয়সা গাছে ফলে? এইটুকু খেতে গাড়ি কিনতে হবে? জানিস, আমার বাবা কুমিল্লার গরিব মাস্টার ছিলেন। রোজ ছ'ক্রোশ হেঁটে ইশকুলে পাড়াতে যেতেন। তাঁর ছেলে হয়ে আমি পয়সা নী করব?'

মলয় কী বলবে বুঝতে পারে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে খানিক, তারপর বলে, 'অভিই যখন টাকার হিসেব তখন এই বাজারে ডিরিশ টাকা ভিজিট নেন কেন?'

'তাতে তোমার বাপের কী রে হারামজাদা?' কমল দাঁত কিড়মিড় করে বলেন, 'সবাই টাকা টাকা করলে গরিব মানুষগুলো কোথায় যাবে? আর তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে? তোমার টাকা তো চিকিৎসাতে পাস, নাকি? রোজ এক প্রু। আর যদি কখনও এসে শুনি, জুড়িয়ে কলকাতা ছাড়া কবাব তোকে!'

বড়রাস্তা থেকে ডান দিকে ঢুকে গেলেন কমল। আর-একটু এগোলেই পাড়ার মোড়।

গত পঁয়তাল্লিশ বছর এই পথে যাতায়াত করছেন কমল। ডা. হরনাথ ঘোষ ওঁকে নিয়ে এসেছিলেন এই ডিসপেনসারিতে। বসেছিলেন, 'গরিবগুলোর খুব কষ্ট রে কমল। একটু লেবিস।'

কমলকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর পিছনে হরনাথ ঘোষের অসহায়তা অনেক। তাই ওই মানুষটার কথা ফেলতে পারেননি। আসলে গরিব, আবছা মানুষগুলোকে দেখলে নিজের বাবার মুখটাই মনে পড়ত কমলকে।

মনে পড়ত? আজও কি মনে পড়ে না? চোখ বন্ধ করলে আজও তো স্পষ্ট দেখতে পান কুমিল্লার সেই বহুড়িয়া গ্রাম। সুপরিচায়ের

সারি। দেখতে পান, বিকেলের মুখে বাবা খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছেন। মনে হয় হাড় বাড়ালেই ধরতে পারবেন বাবাকে। মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা।

পুরনো কোনও কিছুকে ছাড়তে পারেন না কমল। ফেলে আসতে পারেন না পিছনে। তাই জীবনে অনেক অনেক সফল হয়েও এই গরিব মানুষগুলোকে ছাড়তে পারেননি। এই সাইকেলটাকে ছাড়তে পারেননি। ছাড়তে পারেননি সহজিয়া জীবন।

কিন্তু আশপাশের মানুষজন শুধু ওঁর সিটিখিটে রূপটাই দেখে। তাই আড়ালে ওঁকে 'সিটিকমল' বলে ডাকে। কিন্তু আসল মানুষটাকে আর কে কবে শেখল।

পাড়ার মোড়ের কাছে এসে সাইকেলের গতি কমালেন কমল। আর সনে-সনে বিরক্ত হলেন বুবা। এই ছোট গলিটার আলো কিছুতেই ঠিক থাকে না। বতবার লাগানো হয় ততবার কাঁরা যেন ডেঙে দেয়। যত সব অসভ্য ছেলেকিলের দল।

সাইকেলের সামনের আলোটা খুব একটা শক্তিশালী নয়। ওঁর চোখের মতো সাইকেলের আলোর জোরও কমছে। তাই সামনের আবছায়া পথটা দেখে মনটা ডেঙো হয়ে গেল কমলকে।

আকাশের দিকে একবার তাকালেন কমল। আধগালা চাঁদ খুলে রয়েছে গাছের মাথায়। খোঁষাশোর পলিথিনের ভিতর দিয়ে দু'-একটা জেদি তারাকে দেখা যাচ্ছে শুধু। যাকিটা ঝাপসা। অন্ধকার।

কমল রাগে বিভ্রান্ত করে উঠলেন। তারপর সাইকেলের হ্যান্ডলটা গলির দিকে ঘুরিয়ে সাবধানে প্যাডেল চাপ দিলেন। আর ঠিক তখনই দেখলেন সেই দু'শট। সর্ক গলিটার ভিতরের কারা ওরা আছা মতো? আশ্চর্য! সব সময় কেউ না কেউ পথ আগলে রাখে। এই দেশে কারও সিডিক সেলুই তৈরি হয়নি। কমলের বিরক্তি বাড়ল। উনি জোরে বেল বাজালেন। আর অজুত শব্দের সাইকেলের ঘণ্টা রাত কাঁপিয়ে টিউ-টিউ করে উঠল!

এক

টিউ-টিউ। সাইকেলের ঘণ্টা পাড়া কাঁপিয়ে ডেকে উঠল দু'বার। শব্দটা দিয়ে শিনের মতো ফুটল কানের ভিতর। আমি ধড়ফড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। মাথার ভিতরটা কেমন যেন কট করে উঠল। কী বিপদ। এখানে রোজ সকালে এমন করেই ঘুম ভাঙবে নাকি? লোকটা এখনও সাইকেলের সেই বেলটা পালাটায়নি। আচ্ছা সিটকেল মানুষ তো। সাইকেলে কেউ এমন এরাগেলনের হর্ন লাগায়।

আমি চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলাম একটু। মাথার ভিতরে বোলতার হলটাকে মিলিয়ে যেতে দিলাম। তারপর চোখ খুললাম আবার। দেওয়ালে ঝোলানো নীল ঘড়িটায় দেখলাম, সকাল সাড়ে আটটা বাজে। আর-একটু শোব? ঘুম হয়ে কি? শরীরটা খুব অগোছালো হয়ে আছে। দশ বছর গুম চারপাশের সব কিছুকেই এখন কেমন যেন অচেনা লাগছে। তার উপর জেট ল্যাগ তো আছেই। শিকাগোয় এখন সেবে রাত। আমার ঘুমের সময়ও হয়নি। বাড়জোর ডিনার নিয়ে ল্যাপটপে কোনও মুভি খুলে বসেছি। সেখানে এই সকাল সাড়ে আটটার বিজ্ঞি শহরটাকে আমার কেমন কেমন যেন অচেনা লাগছে।

গতকাল রাত দুটোয় ফিরেছি শহরে। স্নেন থেকে প্রথম দিল্লিতে নেমেছিলাম দুপুরবেলা। সেখান থেকে কলকাতার কানেক্টিং ফ্লাইটটা এত দেরি করেছে যে, বলার নয়। ডাগিস কাকু একটা গাড়ি ভাড়া করে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে।

আমি বিছানায় গুলাম আবার। সেবি, আর-একটু ঘুম আসে কি না। আসলে গতকাল শেখরাতে শুয়ে ঘুমোনের চেষ্টা করেছিলাম একটু। কিন্তু শরীরের ঘড়ি এত তাড়াতাড়ি পালাট খায় না। সাড়ে দশ এগারো ঘণ্টার পার্থক্যটা এত সহজে যেটে না।

জা-ও দুখটার চেষ্টায় ভোর পাঁটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয়তো জার্মির ফ্রাঙ্কিটা অনুভবের কাজ করেছিল। তবে এই বিকট

বেলের জ্বালায় ঘুমোয় কোন কুণ্ডকর্ণের সাথ। ডাবলাম, লঙ্ঘায় নিশ্চয় এমন সাইকেলওয়ালার ছিল না। থাকলে হুঁমাস কেন, কুণ্ডকর্ণ হুঁমাসটা টানা ঘুমোতে পারত কি না সন্দেহ।

খটখট করে একটা শব্দ হল দরজায়। ওঃ, জ্বালাতন। আমি আবার উঠে বসলাম। এখন কে এসে আমার ঘরে?

বিছানা থেকে উঠে চোঁটা পায়ে গলিঘে ঘরটার দিকে তাকালাম। ব্যঙ্গপত্র কিছুই বোলা হয়নি এখনও। গতরাতে কোনওমতে একটা নাইট ড্রেস বের করে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘরটা দেখে নিজেই বিরক্তি লাগল। আমি খুব ফিটফাট থাকতে পছন্দ করি। কিন্তু ঘরটা দেখে মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছি।

খটখট করে আবার শব্দ হল।

দরজাটা খুলে একটু ধমকে গেলাম। একটা বছর উনিশের মেয়ে। ক্যাপ্রি আর টি-শার্ট পরে দাড়িয়ে রয়েছে সামনে। হাতে একটা ছোট্ট চোঁটা। তাতে চা আর বিক্টিট রাখা।

‘দাদাভাই, তুমার চা।’

পাকু! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। ওরে বাবা, একসন্নি ছিল তো।

‘আমি বললাম, ‘আয়, ঘরে আয়।’

‘আসব?’ পাকু মাথাটা বাড়িয়ে ঘরটা দেখল।

‘হ্যাঁ, আসবি। আয়,’ আমি সরে দাঁড়লাম দরজা থেকে।

পাকু ঘরে ঢুকে সামনের ছোট টেবিলটার উপরে ট্রেটা রাখল।

বলল, ‘তুমি আমায় চিনতে পেরেছ?’

‘আমি হেসে বললাম, ‘পাকু তো। খুব চিনেছি।’

পাকু হাসল, ‘আসলে দশ বছর হয়ে গিয়েছে তো। তাই ডাবলাম...’

‘আমি বিছানায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালাম।

পাকু বলল, ‘কী বুজছ?’ আশাটো? আমি এনে দিচ্ছি নীচ থেকে।’

‘না রে, শোক করি না।’ আমি হাত দিয়ে বাগিঁশটা সরিয়ে তার ডলা থেকে নেক্কার ড্রপটা বের করে নাকে দিলাম। তারপর বললাম, ‘এটা।’

পাকু আর কী বলবে বুঝতে পারল না। চোঁটাটা চেটে তাকান আমায় দিকে। আমি জানি ও কী ভাবছে। আসলে বিদেশ থেকে দীর্ঘদিন পর কেউ এলে তাকে নিয়ে থিখা, সন্দেহ আর ভুলিঙ্গাগাওলো মানুষের মনে ঝট পাকিয়ে যায়। তাকে আপন মনে করতে হচ্ছে করলেও মনে হয়, সে হয়তো আর আমাদের আপন ভাবে না। যা আমাদের তৃতীয় বিশ্বের অনুভূত মানুষ ভেবে করুণা করে। তাই ভাললাগাটা ঠিকমতো সামনে আনতে পারো না মানুষজন। আমি জানি পাকুরও এখন তেমনই মনে হচ্ছে।

‘আমি বললাম, ‘পাকু, আমি তো চা খাই না।’

‘চা খাও না? তবে কী খাও? কফি?’

‘আমি মাথা নাড়লাম, ‘ওসব বাদ দে। আমি কিছুই খাই না। তুই তোর কথা বল। কী পছন্দি?’

পাকু বলল, ‘ইঞ্জিনিয়ারিং। কম্পিউটার সায়েন্স।’

‘ব্যাং, দারুণ তো।’ আমি পা তুলে বসলাম বিছানায়।

‘হাই দারুণ,’ পাকু মাথা নাড়ল, ‘এখন এখানে পাড়ায়-পাড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। যে-কেউ পড়তে পারে। কেরামতি লাগে না। এডুকেশন হ্যাঙ্ক বিকাস বিকসেসে হিয়ার। আর বোলো না দাদাভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না পড়ার। ভেবেছিলাম কিওলজি নিয়ে পড়ব।’

‘তা পড়লি না কেন?’ আমি জোর করে প্রশ্ন করলাম। আসলে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

পাকু বলল, ‘বাবা বলল। প্লাস এইচএস-এর রেকর্ডে ভাল হয়নি। তাই...যাকগে। তুমি কখন ব্রেকফাস্ট করবে? মা জিজ্ঞেস করতে বলল। লুচি করছে।’

‘আমি ধমকে গেলাম একটু। এখানে যেটাকে ব্রেকফাস্ট বলে, সেটা আর আমি খেতে পারব না। ওই ভুবে ভেলে লুচি। লহুঁ আর

শুকনো লহুঁ দেওয়া আগুনের মতো আলুর দম। ওগুলো খেলে দু’মিনে হসপিটালে ডাক্তি হতে হবে।

‘কাকিমাকে ওসব করতে বারণ কর পাকু। আমার ওসব খাওয়া বারণ। আমি সকালে ওটস খাই। বা কন্সেন্স উইথ মিঙ্ক। সঙ্গে ফল, ফলের রস আর একটা ডিম।’

‘এঃ,’ পাকু নাক ভেঁকালল, ‘কী জঘন্য। ওসব কেউ খায়?’

‘আমি উঠে দাঁড়লাম। কথা বলার অনিচ্ছোটা আরও জোরালো হয়ে উঠছে আমার। আসলে আমি শিকাগোয় একা থাকি। একটা ওয়ান রুম ফ্ল্যাটে। ওখানে বলে সুঁড়িয়ে। কেউ আমায় বিরক্ত করে না। জোর করে কথা বলে না। আমি জঘন্য খাই, না অমৃত খাই, তা নিয়ে মতব্য করে না। আমি মেনে ওঠার সময় বুঝতে পারিনি, কিন্তু কলকাতায় আসার কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই বুঝতে পারছি, এখানে কটা দিন থাকা আমার খুব কঠিন হয়ে যাবে।

পাকু ট্রেটা নিয়ে নেমে যাওয়ার আগে আর-একবার বলল সূচিটা আঙ্করের মতো খেয়ে নিতে।

এই ঘরটার সঙ্গে লাগোয়া বড় ছাদ। তার আর-এক মাথায় বাথরুম আছে। গডকাল রাতে একবার গিয়েছিলাম। কেমন অন্ধকার, শ্যাওলা-জমা বাথরুম। মেঝেতে সব সময় জল দাড়িয়ে থাকে। টোবাডার তলাটা কেমন কালোমতো। বাথরুমটাই যদি ওই হয় তবে টমলেটটা কেমন হবে কে জানে!

‘আমি ঘর থেকে সিঁড়ির দিকে গেলাম। ছাদে যাওয়ার দরজাটা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর পাশে। সেটা দিয়ে বেরিয়ে ছাদে দাঁড়লাম। আর বহু দিন পরে কলকাতা শহরের দিকে তাকালাম ভাল করে।

‘আমি ছাদের এই ঘরটাতেই থাকতাম আমি। তাই ছাদে দাড়িয়ে চারপাশের দৃশ্য দেখা নতুন কিছু নয়। তবু এখন কত কিছু যে নতুন!

‘দেখাচ্ছি,’ আশপাশে বেশ কয়েকটা বড় বাড়ি উঠেছে। আর দুটো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। একটা রতন সাইদের আর অন্যটা পুলকিতদের।

‘রতন সাইট এখানে একটা মুন্সির সেকান চালাত। আর পুলকিতদের ছিল দুটো ট্যান্ডি। ওরা কি তবে উঠে গেল পাড়া থেকে? এখান থেকে যারা স্টেটসে যায় তাদের মুখে শুনেছি, এই গোটা শহরটা নাকি আন্তে-আন্তে প্রোমোটারদের কবজায় চলে যাচ্ছে। পুরনো সুন্দর বাড়ি ভেঙে ভেঙা কিছুই ভরে যাচ্ছে চারদিক। কিন্তু সেই আগ্রাসন যে আমাদের এই পাড়াতেও ঢুকে পড়েছে, সেটা বুঝতে পারিনি।

‘কালীপুজো শেষ হয়েছে সব। কিন্তু শহরে তার প্রভাব আছে এখনও। পাড়ার মেড়ের প্যাভেলের কাপড় সরিয়ে নিলেও বাঁশের কাঠামো রয়ে গিয়েছে। ফলে রাস্তাটাও সরু হয়ে গিয়েছে।

‘সত্যি। দশ বছরে এই ইনভিসিবিলিটা একই রয়ে গেল। অজ্ঞাতই দীর্ঘবাঁশ বেরিয়ে এল আমার। এসে কি ভুল করলাম। যা চোখে পড়ছে তাতেই তাই বিরক্তি লাগছে। মনে হচ্ছে এ কোথায় টেঁসে গেলাম রোবা। তারপরেই মনে হল, আল্লাহ দশ বছর আমি কি পাগলে গেলাম? সব হয়ে গেলাম? নিজেই কি তবে আমি আশপাশের সবার চেয়ে সুপরিবার ভাবছি?

‘ফ্রেণ্ড হয়ে ঘরে এসে দেখলাম কাকু বসে রয়েছে বিছানায়। হাতে খবরের কাগজ।

‘আমায় দেখে বলল, ‘পায়খানা হয়েছে? মানে, নতুন জায়গা তো। প্লাস বালা স্টাইল। মানে, তোদের তো চেয়ারে বসে হাগা অভেস।’

‘আমি চোয়াল শক্ত করলাম। সকাল-সকাল এসব অমৃতবাণী শোনার জন্যই কি আমি এখানে এসেছি? কাকু সফুয়ার পকেট থেকে একটা খাম বের করে বলল, ‘এই যে নান্দারটা।’

‘কিসের নান্দার?’ আমি অবাক হলাম।

‘আরে। ভুলে গেছি।’ কাকু বিরক্ত হল এবার, ‘এমন স্মৃতিশক্তি নিয়ে কী গবেষণা করিস তুই? আরে, পুজার নান্দার এটা।’

‘আমি ধমকে গেলাম প্রথমে। তারপর মাথার ভিতর আলো জ্বলল।

ও হরি। এই কেস? পূজা। কাকু সেটা ধরে বসে রয়েছে?

আমি বললাম, 'তোমার কাছেই রাখো না। পরে নেব। এই তো এলাম জাস্ট। একটু খিঁজতে দাও।'

কাকু বলল, 'তা ঠিক। আসলে মিস্টার গান্ধী মানে ওর বাবা তো সকাল ছ'টাত্তেই ফোন করেছিলেন। জিঙ্সে করছিলেন তুই এসেছিস কি না। মানে, ভালভাবে এসেছিস কি না।'

'উনি ফোন করেছিলেন কেন?' আমি অবাক হলাম। বৃষ্টিতে পারলাম না এই মিস্টার গান্ধী ডব্লিউলোকের আমার আশা-যাওয়া নিয়ে এত মাথাব্যথার কারণ কী।

'বাঃ, করবেন না?' কাকু খুব অবাক হল। শেপারটা শুটিয়ে বলল, 'আরে, তার মেয়েকে বিয়ে করবি, সে তোর হবু শ্বশুরমশাই। জামাইয়ের খবর নেনেব না।'

আমি বললাম, 'কাকু আমি একটু জেস পালটাব। তুমি নিচে চলে, আমি আসছি।'

'জেস পালটাবি? কেন?' কাকু অবাক হল।

আমি বললাম, 'বেরোব। একটা ফোন কিনব। নতুন নাথার নিতে হবে।'

'এই ক'দিনের জন্য?' কাকু অবাক হল।

'হ্যাঁ কাকু। তুমি নিচে যাও। আমি আসছি।' বিরজিটাকে চেপে আমি যথাসম্ভব শাস্ত গলায় বললাম।

পরের এক ঘণ্টায় আমি আমার দুটো বড় স্টুকেস আনপ্যাক করে দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখলাম। তারপর জামাকাপড় পালাটে একটা বড় প্যাকেট নিয়ে নিচে নামলাম।

এই বাড়িটা তিনতলা। একদম নিচের তলায় ঠাকুমা থাকে। আর দোতলায় থাকে কাকুমা। মানে কাকু, কাকিমা, পাকু আর বিলু। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই লম্বা বারান্দা। পুরনো দিনের সবুজ মেঝে। কাপো চণ্ডা বর্জার দেওয়া।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই সেই পুরনো গছটা পেলাম। ঠাকুমা সকালবেলা স্নান করে পূজোর সময়ে নিচের তলায় যে ধূপ ছালায়, সেটা কী করে যে দোতলা অবধি উঠে আসত কে জানে। দেবলাম, ধূপের গন্ধ আজও সেই পথ ভোলেনি। বহুদিন পরে এই একটা গন্ধ আমানত বুকের ভিতরের মাটি বসিয়ে দিল। কোনও কারণ ছাড়াই ছেঁয়ালির কাছটা শিরশির করে উঠল।

'দাদাভাই, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়,' বিলু ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

বিলুকে দেখে ভাল লাগল। ও পাকুর সিনি। এখন তেইশ কি চকিশ চলছে। কী করছে কে জানে। আসলে সকলের কাছ থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি যে, আর কারও খবর রাখি না।

'কী রে, আয়,' বিলু দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল আবার।

আমি হেসে এগেলাম।

বিলুর ঘরটায় আগে কতবার এসেছি। কিন্তু আজ তা-ও কেমন যেন নতুন লাগল। দেবলাম, গত দশ বছরে ঘরের দেওয়ালে রং হয়নি। জায়গায় জায়গায় ড্যান্টার দাগ। প্লাস্টার খসে পড়ছে। নভেম্বরের শেষ বলে সামান্য ঠান্ডা থাকায় ঘরের ফ্যানটা চলছে না। কিন্তু আমার গরম লাগছে খুব। শিকাগোর ওই ডম্বকন ঠান্ডায় থাকতে-থাকতে এটাকে আমার সামার মনে হচ্ছে।

আমি এমিক-ওমিক তাকালাম। ঘরে দুটো খাট। দুই বোনের। আর একটা টেবিল, চেয়ার, আলমারি এবং আলনা। আবাবাবপন বেশি নেই, তাতেও যেন ঘরটার ফাটো-ফাটো অবস্থা।

'এখানে বোস,' বিলু বিছানা থেকে ওর বই-খাতা সরিয়ে নিয়ে বসার জায়গা করে দিল আমায়।

আমি বসলাম। হাতে ধরা প্যাকেটটা বাড়িয়ে বললাম, 'এটা রাখ। তোমের জন্য কয়েকটা জিনিস আছে।'

বিলু কিছু বলার আগেই 'জিনিস' বলে লাক দিয়ে দরজার কাছ থেকে ঘরের ভিতর খাঁপিয়ে পড়ল পাকু। তারপর কেউ কিছু বোঝার

আগেই ছেঁ মেরে তুলে নিল প্যাকেটটা। আমি অবাক হলাম। পাকু কখন এসে দাঁড়াল দরজায়।

'কী করছিস কী!' বিলু বিরক্ত হল, 'এমন অসভ্যতা শিখলি কোথা থেকে?'

পাকু বিছানায় বসে ফ্রডহাতে প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বলল, 'টিভি খেঁকো।'

আমি কী বলব বৃষ্টিতে পারলাম না। পাকুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। পাকু প্যাকেটটা খুলে তার ভিতর থেকে চারটে বিভিন্ন মাপের প্যাকেট বের করে আনল।

আমি প্রতিটা প্যাকেটের গায়ে নাম লিখে এনেছিলাম। পাকু নিজেরটা নিয়ে নিয়ে চটপট খুলে ফেলল মোড়কটা। তারপর উন্মোচিত হয়ে চোঁচিয়ে বলল, 'ওঃ, কী দারুন। পারফিউম।'

বিলু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসব এনেছিস কেন দাদাভাই? বিদেশ থেকে এলেই কি কিছু নিয়ে আসতে হবে? সত্যি। এটা তো রিফ্রেশিভ ধারণা। আর এখন এখানেই সব কিছু পাওয়া যায়। কেন এসব করিস।'

'ইচ্ছে হল,' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম, 'ঠাকুমার পূজো হয়ে গিয়েছে, না? যাই একটু দেখা করে আসি। কাল তো আর রাতে দেখা হয়নি।'

পাকু বলল, 'লুচি খাবে না? মা খি দিয়ে ভেজেছে।'

আমি হাসলাম, 'শেষে সহ্য হবে না।'

'বাগি বাজো কথা।' পাকু দরকারের চেয়ে বেশি হাসল, 'কত দাম এই পারফিউমটার? ঘ্যামা গছ কিন্ত।'

বিলু ধমক গিয়ে বলল, 'হাইট অব ইনডিনেসনসি। তুই যা দাদাভাই। ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আয়।'

আমি ঘর থেকে বেরোলাম। আবার সেই লম্বা করিডর। সেই সবুজ ঠান্ডা মেঝে। আর আবার সেই বুকের মাটি নরম করে দেওয়া ধূপের গন্ধ। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বহু বছর আগের একটা সন্ধ্যা। ভেসে উঠল জমে থাকা পাড়ার লোক। পুষ্টিপের ভ্যান। ছিন্নভিন্ন একটা বাড়ি।

জানালার সামনে বসে বাইরে থেকে আসা রাসের নিচে একটা বই খুলে পড়ার চেষ্টা করছিল ঠাকুমা। কতদিন পর দেবলাম। দশ বছরে যেন ডিগ্রিশ বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে মানুষটার। মুখের চামড়ার অজস্র ফাটল। চোখের কাণোয় মুক্তোর পুঁতি। মাথার চুল পাতলা হয়ে পুরনো রংটা গুলুকের মতো হাছে আছে।

'ঠাকুমা!' আমি আলতো গলায় ডাকলাম।

ঠাকুমা মুখ ফেরাল। রাসের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের ভিতরের আলোর সঙ্গে ভাল মেলাতে সময় লাগল একটু। তারপর আমায় নিম্নে তাকিয়ে কেমন যেন ধমকে গেল। হাত থেকে আলগা হয়ে গেল বইটা।

আমি এগিয়ে গিয়ে সামনে ঝুঁকে প্রণাম করলাম, 'গতকাল রাতে এসেছি।'

ঠাকুমা আমার মাথায় আলতো করে হাত রাখল। 'অসুটে বলল, 'স্ক্রুবাবু।'

আমি কী বলব বৃষ্টিতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঠাকুমা হাসল এবার। দাঁত নেই একটাও। কীরকম অসুটে লাগল মেখে। মনে হল দলমোচড়া করে আবার হাত দিয়ে সমান করতে চেষ্টা করা কাগজের মতো লাগছে মানুষটাকে।

বললাম, 'শরীর কেমন তোমার?'

ঠাকুমা আমায় হাত ধরে বিছানার বসাল। বলল, 'শরীর আছে একরকম। তা ক'দিন থাকবি তো? শুনলাম, তুই নাকি বিয়ে করতে এসেছিস? সত্যি?'

আমি কিছু না বলে হাসলাম।

ঠাকুমা বলল, 'ভাল ভাল। সেই যে রাগ করে গেলি আর তো

এলি না। দশ বছর আমাদের কথা মনেই পড়ল না তোর। তা, বড়র কাছে..'

আমি বললাম, 'তোমার জন্য একটা মাসাজার এনেছি। বিকেলে দেখিয়ে দেব। কেমন? পা হাত ভাল করে মাসাজ করতে পারবে।'

ঠাকুমা হাসল, 'আর মাসাজার। আমি কি আর ওসব করে ক্যাটরিনা কাইফ হব নাকি!'

আমি অবাক হলাম।

ঠাকুমা বলল, 'অবাক হচ্ছিস কেন? ছিয়াশি বছর বয়স হয়েছে বলে কি আমি মানুষ নই। হিপি ছবি কী যে ভাল লাগে আমার। এই দ্যাখ।'

আমি দেখলাম, ঠাকুমা এতক্ষণ যেটা পড়ার চেষ্টা করছিল সেটা একটা সিনেমার পত্রিকা।

আমি উঠলাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে রান্না থেকে আসা একটা বিকট গাভর শব্দ যেন করাতের মতো কানের পরমা কেটে গিল।

তার মধ্যেই ঠাকুমা জোরে বলল, 'তোরা সবে আমার খুব দরকারি কথা আছে। বুঝলি? যখন কেউ থাকবে না বাড়িতে, তখন বলব।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম ঠাকুমার দিকে।

ঠাকুমা গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলার চেষ্টা করল কিছু। কিন্তু শুনতে পেলাম না।

বললাম, 'কী? জোরে বলো।'

ঠাকুমা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোরা কাকু আমায় খুন করতে চায়, জানিস। তোকে এর একটা বিহিত করে দিতে হবে। শুধু বিয়ে করলে হবে না কিন্তু। আমার বিকটাও দেখতে হবে, বুঝলি?'

আওয়াজটা বাড়ল যেন। আমি জানলাম গিয়ে বাইরে তাকালাম।

দেখলাম, রান্নার শানওয়ালা রহমত মিঞা সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে বিচ্ছিন্ন শব্দ তুলে শান দিচ্ছে ছুরিতে। দুটো ধাতুর ঘষায় আঙনের ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে চারদিকে। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। প্রাণের কাকু। তারপর এখন ঠাকুমা। একা কী চায় আমার কাছ থেকে? মনে হল ছুরিটা কি আসলে আমার জন্যই ধার দেওয়া হচ্ছে?

॥ ক ॥

ছুরিতে শান দেওয়া হচ্ছে। সাইকেলের প্যাডেল ঘুরিয়ে রহমত মিঞা দু'হাত দিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শান দিচ্ছে ছুরিতে। লোহার ঢাকা থেকে আঙনের ফুলকি গিয়ে লাগছে রহমতের কাশা হয়ে যাওয়া জামায়, হাতে। কিন্তু সেদিকে কনসেপ্ট নেই রহমতের। সে ছুরির ধার বাড়িয়েই চলেছে।

আর্থ বলল, 'দেখছিস? এমন করেই তৈরি হতে হবে আমাদের। এমন করেই মনের ভিতরের ইম্পাউটাকে ধার দিয়ে আগামী পৃথিবীর জন্য তৈরি হতে হবে, বুঝলি?'

'আবার বাতেলা। শালা,' পেরেক বলল, 'ডাট বকায় পিএইচ ডি তোকেই দেওয়া হবে। শান দিয়ে কানের পরদায় পেলমেট খুলিয়ে দিল, আর তুই শালা বাতেলা বেচে বাড়ি কিনবি।'

আর্থ বলল, 'গ্যাখ পেরেক, এসব বলবি না। বাংলার যুবশক্তি আজ তোর মতো ছেলেনের জন্যই..'

'মারব লাখ। যুবকের সত্যিকারের শক্তি দেখবি এবার।' পেরেক ষিটিয়ে উঠল।

আমি বিরক্ত হলাম। বললাম, 'কী করছিস কী? তখন থেকে দু'জন মিলে ঝগড়া করছিস কেন?'

'কেন মানে?' পেরেক রাগ করল, 'ও সকাল বিকেল আউ-বাস্টু কথা বলবে, আর আমায় সেটা মানতে হবে? মামার বাড়ি? শালা সামনে পাড়ার পুজো। চাঁদ কত উঠেছে জানিনা? নকুলদাদা গিয়ে দুর্গাপূজা দিতে হবে এবার। সেখানে কাজ করার নাম নেই, যুবশক্তির বাতেলা বাড়ছে।'

আমি কিছু না বলে চুপ করে গেলাম। সত্যি, আমার কিছু বলার নেই। আমি নিজে তো আর সময় নিতে পারি না এসবে। তাই পেরেক কথাটা যে কতটা আমাকেও বলল সেটা বুঝতে পারলাম।

কিন্তু সময় দেব কী করে? আমার তো পড়ার চাপ খুব। তার ওপর বাড়ির ঝামেলা রয়েছে। তাই অন্য কিছু আমার খুব একটা ভাল লাগে না।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে আর্থ বলল, 'তুই চুপ করে এসব শুনছিস? পুজো করে কী হবে, আর্থ? আমাদের গরিব মেসে আগে দরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সন্ততার পাঠ। সেখানে কোটি কোটি টাকা খরচ করে পুজো হচ্ছে। পাঁচ দিনের জন্য এত টাকা খরচ না করে সেই টাকায় সারা জীবন সুখ পাওয়া যায় এমন কিছু করিস না কেন?'

পেরেক ষিটিয়ে বলল, 'আর্থ, ভাটের কথা বন্ধ করবি? এমন ক্যালাব না তোকে। দেশোদ্ধার করবো। 'রোবিনাথ', 'পেম', 'ম্যোকাং ইলিশ' বলে কুল পাচ্ছে না লোকে। সেখানে ভাট হচ্ছে।'

আমি উঠে পড়লাম। কলেজ থেকে এসে স্টান টেক কেবলি। ভেবেছিলাম, একটু হালকা কথাবার্তা বলব। আড্ডা মারলে মাথাটা একটু ছাড়বে। কিন্তু এই দুটো সারাক্ষণ কামড়াকামড়ি করে। আমার আর ভাল লাগে না।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এখন। পুজো আসছে। সঙ্গে নামলেই কেমন যেন চারদিকে বাষ্প জমে যায়। ছাতিম ফুলের গাঢ় গন্ধ সেই বাষ্পের মধ্যে আঁকে কলকাতার হাওয়া ভারী করে তোলে। আমার মনটা কেমন যেন করে। মনে হয় কে যেন নেই পাশে। কে যেন আসবে বললেই আসেনি।

'কী রে উঠলি?' পেরেক অবাক হল।

পুলকিতদের বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো। চুন-সুরকির গাঁথনি দেওয়া খুঁটো দেওয়াল। আর্ট দেওয়া জানালা। ফুল বারান্দার সিঁহের মুখওয়ালা ড্রেন পাইপ। বাড়িটার বাইরের দিকে চওড়ামতো একটা বাগিচা সোমের বারান্দা আছে। না, কোনও পাল্লি দিয়ে সেটা ঘেঁরা নয়। বাড়ার বিভিন্ন বয়সের লোকেরা দিনের বিভিন্ন সময় এখানে বসে আড্ডা দেয়। বিকেলে ছোটরা, এই সন্ধ্যার নিকটায় আমরা, আর রাতের দিকে পাড়ার বয়স্করা এসে এই জায়গাটা দখল করে। পুলকিতদের বাড়ির কেউ কিছু বল না।

আমি বারান্দা থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললাম, 'বাড়ি যাব। আজ কলেজেও খুব চাপ গিয়েছে। গ্র্যাণ্ডটিকালে ম্যাডাম পুরো খাড়া করে দিয়েছেন। আর ভাল লাগছে না।'

পেরেক বলল, 'তা বসে যা। কলিধাকে বলছি তিনটে ওমলেট করে দিতে। খেয়ে যা।'

'ধূর। তোর ওমলেট রাখ,' আমি ব্যাগটা এবার পিঠে খোললাম।

রতন সাউয়ের মুদি-দোকানের পাশেই কলিধার ফাস্টফুড কাম চায়ের দোকান। এখান থেকেই দেখা যায়। আমরা চেঁচিয়ে অর্ডার দিলে বোঁচকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেয় কলিধা।

কিন্তু আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না। সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় দেখেছি বাড়ির আবহাওয়া একদম ভাল নয়। সেটাই হয়তো অবচেতনে সারাদিন কাজ করছে। হয়তো তাই বিরক্ত লাগছে সব কিছুতে।

আর্থ বলল, 'হিয়ে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?' আমি মোবাইলটা বের করে সময় দেখলাম। পৌনে সাতটা বাজে।

আর্থ ইতস্তত করল একটু। তারপর বলল, 'জিনিতা কি আজকেও...'

'হ্যাঁ আজকেও,' আমি ওকে শেষ করতে দিলাম না কথাটা। দেখলাম, আর্থের মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল।

আমি আর অপেক্ষা না করে বাড়ির দিকে হাটা দিলাম। জিনিতা বাসু আমার সঙ্গেই বি টেক করছে। আসলে আমরা দু'জনেই কেমিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি এসসি করার পরে বি টেক-এ

ভর্তি হয়েছি। ফার্স্ট ইয়ার টপকে এখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি।
জিনিতার বাবা একজন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। বিশেষ থাকেন
বেশির ভাগ সময়। এখানে ওদের ওই কেল্লার মতো বিশাল বাড়িটায়
জিনিতা আর ওর মা থাকে। সঙ্গে পাঁচজন কাক্সের লোক।

জিনিতা গাড়ি করে কলেজে যায়। ফেরেও গাড়ি করেই। আর
অধিকাংশ দিন আমাদের ট্যাক্সি করে পাড়ার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়।
কলেজের বন্ধু থেকে শুরু করে পাড়ার পেরেক পর্যন্ত সবাই বলে,
'এবার থাকে বলে দে রকু। মেয়েটা কিন্তু তোর জন্য গ্রুপের লেবার
সিঙ্গে।'

আমার এসব শুনে বিরক্ত লাগে। কারণ, জিনিতা যতই ভাল
সেবতে হোক, যতই পড়াশোনায় ভাল হোক বা যতই ভাল নাচ
করুক, থাকে আমার সেভাবে পছন্দ হয় না। কেন হয় না সেটা আমি
জানি না। শুধু জানি ও শুধু আমার বন্ধু। আর কে না জানে বন্ধুর
কেনও ছেঁড়ার হয় না।

কিন্তু আর্থর যে জিনিতাকে পছন্দ সেটা আমি বুঝি। না, আর্থ কিন্তুই
স্পষ্ট করে বলে না। কিন্তু তা-ও ওর নানা কথার ভেঁজে বুকি, আর্থ
জিনিতার দিকে কিছুটা ঝুঁকে আছে।

'শোন রকু, সাড়ে সাড়টা নাগাদ এখানে চলে আসিস আবার।
চাঁপা তুলতে যেতে হবে,' পেরেক পিছন থেকে ডিঙকার করে বলল।
উত্তরে আমি পিছন না ফিরেই মাথার ওপর হাত তুলে একটা
ইশারা করলাম। যার মানে 'হ্যাঁ' না 'না', সেটা আমি নিজেও জানি
না।

আমার বাড়ি এখন থেকে একটুখানি বাড়িটা ভিনতলা। নিচের
তলায় আমার বাবা, মা, ঠাকুমা থাকে। সোড়তলায় থাকে কাকু, কাকিমা
আর দুই বোন। আর ভিনতলার একটা ঘরে আমার সাজাখা।

দক্ষিণ কলকাতায় হলেও, আমাদের পাড়াতো এখনও যেন পুরনো
কলকাতার একটা গল্‌ লেগে রয়েছে। পাউন্ডস্ট্রি রঙের বাড়ি, সকল
হলে গোলা পায়রার হাততালি আর চায়ের দোকানের উতনের ধোঁয়ায়
এই দু'বাজার চার সালটাকেও মনে হয় বাটের কলকাতা।

পিছন থেকে একটা অজুত সাইকেলের বেল শুনলাম। 'টিউ টিউ'
সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার এক পাশে সরে গেলাম। এই অঞ্চলে এমন অজুত
ঘণ্টা বাজিয়ে সাইকেল চালান একমাত্র একজনই। বিটকমল।

মানে কমল ডাক্তার। এমন অজুত লোক আমি কোনদিন
দেখিনি। ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছি, করল সেনাপতি বহুদিন এই
অঞ্চলে আছেন। ডাক্তার হিসেবে খুব নামও করেছেন। এমনকী,
পাড়ায় একটা নার্সিং হোমও খুলেছেন। কিন্তু তা-ও সারা জীবন
সাইকেল করেই যাতায়াত করেন মানুষটা। শুনেছি, পল্লবনতলাতে
নাকি একটা দাওয়া ডিসপেনসারিও চালান। গরিব-মুঃখীদের উপকার
করেন। রাস্তার বিশপ মানুষজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের উদ্যোগে
চিকিৎসা করেন।

তা-ও পাড়ার সকলেই খুব ভর পায় কমল ডাক্তারকে। কারণ, উনি
খুব বিটবিটে মানুষ। খোলা গাফ, গোল চশমা আর বন জঙ্গলের
মতো ভুরু নিয়ে যখন কারও দিকে তাকান, মনে হয় খালি চোখেই
এক্স রে করছেন।

কেউ প্যাতপক্ষে ঘটায় না কমল ডাক্তারকে। আর এই বিটবিটে
মেজাজের জন্যই পিছনে সবাই বিটকমল বলে ডাকে।

পেরেক তো বলে, 'শালা, এমন গিটপরা মানুষ জন্মে দেখিনি।
শিওর কনসিপেশন আছে মালটার। না হলে সারাক্ষণ এমন বিটবিট
করে। মনে পুরনো টাইপরাইটার। এই জন্যই কোনও মেয়ে জ্যোতেনি
কপালে।'

বিটকমল পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বিরক্ত গলায় বললেন, 'রাস্তায়
মাঝখান দিয়ে সব হাটে। ঠাকুরমা রাস্তাটা লিখে দিয়েছে কিনা।'

আমি তাকালাম। দেখলাম, বুড়ো নিজেও আমার দিকে দৃষ্টিবান
ছুড়ছেন। আমি কথা না বাড়িয়ে বাড়ির গলিতে ঢুক পড়লাম।

বাড়ির গলিটা সরু। এককালে পিচ হয়েছিল। কিন্তু এখন তার
মুটিটুকুই পড়ে রয়েছে শুধু। এমনকী, আলোও নেই। আশপাশের
বাড়ির জানালা দিয়ে যতটুকু আলো চুইয়ে আসে, তাতেই কোনওমতে
কান্ন চালিয়ে নেয় এই গলি।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা গেট আছে। গেট পেরিয়ে
একখালি উঠোন, তারপর মূল দালান।

আমি গেটটা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। মনটা বেন সঙ্গে-সঙ্গে আরও
বেশি করে বারাপ হয়ে গেল। সকলবেলাটা আরও বেশি করে মনে
পড়ে গেল। ভাবলাম, বাবা কি ফিরেছে?

উঠোনটার রোজ সন্ধ্যাবেলা আলো ছাড়ে। কিন্তু আজ ছিলো না।
কাকুদের সোতলার বারান্দাটায় শুধু একটা কিম খরা আলো ছালে
রয়েছে।

উঠোনের পাশেই জুতো খুলে রাখার জায়গা। জুতোটা খুলে আমি
দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরের ভিতরেও অন্ধকার। শুধু টানা
বারান্দার শেষে ঠাকুমার ঘরের পরঘর নীচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।
আমার ভয় লাগল। মা কোথায়? আবার কিছু করল নাকি?

'মা,' আমি সামনের ঘরটার দিকে এগোলাম।

টানা বারান্দার পাশে দুটো ঘর। তার পাশে রান্নার জায়গা। মা
নিচয় ঘরের ভিতরে রয়েছে।

আমি আঙে করে ঘরের দরজাটা ঠেললাম। ক্যাচ শব্দে খুলে গেল
দরজাটা। ভিতরটা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'মা,' আমি আবার ডাকলাম। তারপর পা দিলাম ঘরের ভিতরে।
আর সঙ্গে-সঙ্গে গল্‌টা পেলাম। বোটকা মদের গন্ধের সঙ্গে কাঁজালো
টক গন্ধ। আমি ধমকে গেলাম একটু। মাথাটা গরম হয়ে গেল।
বুখলাম, মায়ের একতরফা ঝগড়াকে পাত্তা না দিয়ে সেই যে বাবা
বেরিয়ে গিয়েছে, এখনও বাড়ি ফেরেনি।

প্রায় সময় নিলাম একটু। তারপর হাত বাড়িয়ে আলোটা
ছাঁসলাম।

এই ঘরটা বেশ বড়। ঘরের এক পাশে বিছানা। আর সেখানেই
উপড় হয়ে শুতে আছে মা। মায়ের মাথাটা বিছানার ধার থেকে অর্ধেক
খুলছে। পাশেই একটা খালি মদের বোতল। মেঝেতে হলদে রঙের বমি
জমাট বেঁধে আছে। কয়েকটা মাছিও উড়ছে।

আমার গা গুলিয়ে উঠল নিমেষে। কোনওমতে মুখে হাত চাপা
দিয়ে নিজেকে সামললাম। তারপর ঘরটাকে দেখলাম। সব জানালা
বন্ধ। তাই বন্ধ ঘরের ভিতরটা এমন নরকের মতো হয়ে আছে।

আমি পিঠের ব্যাগটা পাশের টেবিলে রেখে দ্রুত গিয়ে চারটে
জানালা খুলে, বড় পরদাগুলো সরিয়ে দিলাম। বাইরের হাওয়া এখন
ঘরে আসা খুব জরুরি।

আমি এবার ভাল করে মাকে দেখলাম। মুখের পাশে বমি শুকিয়ে,
লেগে রয়েছে। মানে, বমি করার পর আর ঠিকমতো শোওয়ার
অবস্থাও ছিল না।

হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা বিছানা থেকে নিলাম। পুরোটা
খালি। এতটা খেয়েছে। এক বেলার মধ্যে।

আমি বোতলটা নিয়ে ঘরের বাইরে এলাম। তারপর জঞ্জাল
ফেলার জায়গায় সোঁতাকে ফেলে দিয়ে বাথরুমে গেলাম। এক বালতি
জল। মগ আর ন্যাকড়া নিলাম। যা করার আমাকেই তো করতে হবে।

ঘর পরিষ্কার করতে আমার মিনিট পনেরো লাগল। নোংরাগুলো
বাইরে ফেলে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুলাম ভাল করে। তারপর
রান্নার থেকে বড় এক গ্রাস লেবুর শরবত তৈরি করে ঘরে নিয়ে
গেলাম।

মা এখনও অচেতনভাবে শুতে আছে। আমি যদিও মুখটা মুছিয়ে
পরিষ্কার করে দিয়েছি, কিন্তু তাতেও ইঁদ্র নেই। বাজাসের মতো
অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

আমি গ্রাসটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখলাম। তারপর ঝুঁকে
পড়ে মায়ের মাথায় হাত দিলাম।

‘মা, মা!’

মা একটু সময় নিল। তারপর নড়ল অল্প।

আমি আবার ডাকলাম, ‘মা, শুনলি?’

‘কে?’ মা এবার পাশ ফিরল ধীরে। তারপর কষ্ট করে, টেনে চোখ দুটো খুলল।

‘আমি মা, রুকু!’

‘রুকু’ মায়ের গলাটা এখনও জড়িয়ে আছে।

বললাম, ‘আমি ধরছি, তুমি একটু উঠে বোসো। লেবুজল এনেছি।’

মা এবার ক্রান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে নিল আবার। দেখলাম, চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। আমার চোখ ছালা করছে। রোজ-রোজ বাড়িতে এসব ভাল লাগে না আমার। বাবা কই? কোথায় গিয়েছে? একটুও ঘাবড় নেই মায়ের প্রতি।

আমি মাঝে শক্ত করে ধরে উঠিয়ে বাটার হেড বোর্ডে ঠেস দিয়ে বসলাম। তারপর গ্লাসটা নিয়ে টেবিলের কাছে ধরলাম। বললাম, ‘খেয়ে নাও!’

মা তাকাল আমার দিকে। কেনম যেন অগোছালো, টালমালু দৃষ্টি! নেন বাক্য মেয়ে। ঘুম থেকে উঠে বাবার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

‘খেয়ে নাও। ভাল লাগবে,’ আমি জোরের সঙ্গে বললাম এবার।

মা কাশা হাতে গ্লাসটা ধরল। তারপর একটু চুমুক দিল জলে। আর চুমুক দিয়েই মুখটা সরিয়ে নিল। ভুরু কুঁচকে একবার ‘ওয়াক’ তুলল।

আমি ছড়ালো না। বললাম, ‘খেয়ে নাও বলছি। আন্তে-আন্তে খাও। তাড়াহুড়া করছ কেন? রোজ-রোজ এসব ভাল লাগে না আমার!’

মা এবার সময় নিয়ে পোটা গ্লাসের জলটা শেষ করল। তারপর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি গ্লাসটা নিয়ে রাখলাম টেবিলের ওপর।

মা যেন দম নিল একটু। তারপর বলল, ‘তোমার বাবা এসেছে?’

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, ‘যখন ঝগড়া করো মাথায় থাকে না কিছু। সকালে কীসব বলছ মনে আছে তোমার?’

মা মাথা নীচু করল। তারপর গরুর গলায় বলল, ‘তুই শুধু আমার দোষই দেখিস। আমি শুধু দোষ করি, না?’

আমি মাথার চুলটা খামচে ধরে নিজেকে সামলালাম। তারপর বললাম, ‘তুমি যদি এমন করো, তাহলে কি সব ঠিক হয়ে যাবে মনে হয়? যা বলো তার জন্য তোমার হাতে কোনও প্রমাণ আছে?’

মা কী বলবে বুঝতে না পেরে দু’হাতে মুখ ঢাকল।

আমি কড়া গলায় বললাম, ‘কোনও উত্তর না থাকলেই কাঁদতে হবে, না? তুমি এমন করো কেন? কেন এসব খাও? কোনও সুখ বাড়িতে দেখেছ এসব হয়?’

‘আমার তবু মেরে ফেল। তোরা বাপ-ব্যাটা মিলে আমায় তবু মেরেই ফেল,’ মা আচমকা হিটকে উঠল। কিন্তু তারপর টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল বিছানায়।

আমি বললাম, ‘তোমার লজ্জা লাগছে না। এমন কাজ করে আবার রাগ করছ? তুমি আর বাবা মিলে আমার জীবনটাকে তো নরক বানিয়ে ছেড়েছ। তা-ও এতকু অনুশোচনা হয় না?’

মা হাতে ভর করে উঠে বসল আবার। তারপর বলল, ‘নিজের বাপকে বলতে পারিস না এসব? সে তো কোন আঘাটায় পড়ে আছে। সে ভাবে আমার কথা? আমি মরলাম না বাঁচলাম, ভাবে? বেশ করব মদ খাব। আমার বাবার রেখে যাওয়া টাকার আমি খাই। তোমার বাপের টাকায় খাই না। বেশি কথা বলবি না। জুড়িয়ে মুখ হিঁড়ে দেব জানোয়ার। আর তুই এমন লাইবি তো। গায়ে বাপের রক্ত আছে যে!’

আমার আচমকা ক্রান্ত সাহসি বুঝ। মনে হল বাপের ভিতর থেকে সমস্ত হাওয়া যেন বের হয়ে গিয়েছে এক নিমেষে। আমি মায়ের দিকে তাকালুম। চুল এলোমেলো, চোখ লাল, মুখ দিয়ে লালো গড়াচ্ছে।

দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব একটা স্বাভাবিক এখনও হয়নি।

আমি গ্লাসটা তুলে পিছনে ফিরলাম, টেবিলের ওপরে রাখা পিঠের ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

শুনলাম মা বলছে, ‘তোকে কে বলেছে আমায় সুস্থ করতে। আমি মরলে দু’জনে থাকিস ভাল করে। তোমার বাপ তো সেই তালেই আছে। কবে আমি মরব, আর কবে আর-একটাকে ঘরে তুলবে। তখন দেখিস তোমার সং মা তাকে কত সোহাগ করে!’

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আমি জানি মা এখন নিজের মনে এসব বলবে খানিককণ। তারপর একা-একা কাঁদবে। আর সব শেষে উঠে ভ্রান করে স্বাভাবিক হবে।

আমার মা মানুষ হিসেবে খুব ভাল। কিন্তু বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তার ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি। আসলে সকলেই তো মনের ওপর চাপ একভাবে সামলাতে পারে না!

তিনতলায় ওঠার আগে আমি ঠাকুমার ঘরের পাশে দাঁড়ালুম।

শুনলাম, ঘরের ভিতর থেকে হিন্দি ফিল্মের গান ভেসে আসছে। ঠাকুমা এমনই। নিজেকে নিয়েই সারাদিন মশগুল। এই যে বাবা-মায়ের মধ্যে রোজ কুক্কন্দ হয়, মা হিসেবে সেসবের মোটেই কোনও নজর নেই ঠাকুমার। হয় বাংলা সিরিয়াল নয়তো হিন্দি ছবির গানের চানেল। বাস, এতেই ঠাকুমার দিন কেটে যায়।

আজকাল এই বাড়িটা আমার বিষময় লাগে। মনে হয় পাগিয়ে যাই সব ছেড়ে, সকলকে ছেড়ে। এখানে সকলেই তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত! সকলেই নিজের-নিজের খেলায় মগ্ন। তাহলে আমিই বা নিজের নিকটা দেখব না কেন। তাই আমি চেষ্টাও করছি যাতে বিদেশে পড়তে চলে যাওয়া যায়।

তিনতলায় গিয়ে দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় পাালটে নিলাম।

নাঃ, ব্যস্ততা ভাল লাগছে না। পেরেক বলেছে ঠেকে যেতে, সেরেইনি যাবে। অন্তত এর চেয়ে তো খারাপ কিছু হবে না।

জানি না রাতে আঙ্গোঁ রাহা হবে কি না। কারণ, এমন দিনগুলোয় মা রান্নাঘরে ঢোকে না। ঠাকুমা ঠিক দুখ-খই খেয়ে নেবে। কিন্তু আমাদের তো কিছু ছুটবে না।

আমি ড্রয়ারটা খুললাম। তারপর ছোট একটা ব্যাগ বের করলাম।

এটা আমার টেক্সারি। সপ্তাহে দু’দিন আমি একটা ডিউটোরিয়ায় কেমিস্ট্রি ক্লাস নিই। মাসে ওরা আমায় বাইশ শো টাকা দেয়। আমার কাছে চোটা অনেক। সেই টাকটা আমি জমাই। এই পৃথিবীতে একটা জিনিস বুঝেছি। নিজের অর্জন করা বিদ্যা আর ধন ছাড়া বিশেষ আর কেউ পাশ দিবে না।

কুড়ি টাকার দুটো ডিম ভরকা আর ছটা রুটি হয়ে যাবে। মা আর আমার। আমি জানি, মা আজ কিছুতেই খেতে চাইবে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়ার দিনগুলোয় মা কেনম হয়ে হয়ে যায়। খুব জ্বল করে। রাগ করে। খাবার ছুঁতে চায় না। কিন্তু তা বলে তো আর হয় না। মাকে তো আমি এভাবে দেখতে পারি না।

টাকটা পকেটে আলাদা করে নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে ঝড়ের বেগে নামলাম। কাকুদের মোতালাটা শান্ত হয়ে আছে। শুধু কাকিমার ঘর থেকে আবহা গিঁড়ির শব্দ আসছে।

কাকুরা একই বাড়িতে থাকলেও আলাদাই থাকে। খুব মরকার না পড়লে কথাও বলে না। আমি বৃষ্টি, আমাদের এড়িয়ে চলে। একদিন তো শুনেছি কাকিমা কাকুকে বলছে, ‘এতো একেবারে নর্মদার অধম। কোন ভদ্র বাড়ির খউ এমন মদ খেয়ে উলটে পড়ে থাকে বলা তো?’

এসব শুনলে আমার মাথার ভিতর আশুন ছলতে থাকে। মদ খাওয়াটাকে আমি ভদ্র-অভদ্র বা পুরুষ-নারীতে ভাগ করি না। যে-কোনওরকম নেশাই বাজে লাগে আমার। আর এই দু’হাজার চার সপ্ত-এখনও কেউ কোনও কান্ডকে ছেসে-মেরে নিয়ে ভাগ করছে শুনলে গা রি রি করে। বৃষ্টি, যারা এসব বলে তাদের প্রকৃত শিক্ষার মান কীরকম।

এই সব নানা কারণে আমি নিজেও তাই কাকুদের সঙ্গে কথা বলি না বিশেষ। শুধু বিলু আর পাকু মাঝে-মাঝে আসে আমার কাছে। পড়া বুকে নেয়। গল্প করে। ওদের সঙ্গে কথা বলেই আমার যা একটু ভাল লাগে।

আমি নিচে এসে মাঘের ঘরে উকি দিলাম। দেখলাম, মা এবার ভাল করে শুয়ে আছে। চোখ দুটো বন্ধ। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে আবার। আমি আর কথা বাড়ানাম না। শুধু আলতো করে হাত বাড়িয়ে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে ডিম লাইটটা জ্বালিয়ে দিলাম।

উঠানে এসে জুতোটা গলালাম পায়ে। তারপর গেটের দিকে এগোতে যাব এমন সময় পকেটে মোবাইল বাজল।

কে আবার। মোবাইলটা বের করে সবুজ আলোর ক্রিনে নামটা দেখলাম। পেরেক!

‘কী হয়েছে?’ আমি কথা বলতে-বলতে মেন গেটা বুলে বাইরে বেরোলাম।

‘কোথায় তুই? প্রায় আটটা বাজে। শালা, আজ অন্তত চাঁদটা তুলতে চা!’

‘আসছি আসছি, দাড়া...’ আমি কথাটা শেষ করতে পারলাম না। কারণ, পিছন ঘুরে অন্যান্যদিকের দেখতে না পেয়ে একজনের সঙ্গে খুব ছোরে ধাক্কা লেগে গেল। আমার হাত থেকে মোবাইলটা হিটকে পড়ে গেল। আর হার সঙ্গে ধাক্কা খেলাম সে-ও টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে।

আমরা এমনতিয়েই মাথা গরম ছিল, এবার স্টোই রাগ হয়ে বেরোল। আমি চিংকার করে বললাম, ‘কে তুমি? চোখে দেখতে পাও না? দিলে তো মোবাইলটার ব্যাটারি বাড়িয়ে? যত সব...’

‘আমি ফেলেছি? আমি চোখে দেখতে পাই না?’

গলা শুনে থমকে গেলাম। আবহা গলির সামান্য আলোর দেখলাম একটা মেয়ে।

মেয়েটা বলল, ‘বুঝ অসভ্য তো তুমি। নিজে ধাক্কা দিয়ে এখন বাজে কথা বলা হচ্ছে?’

আমি মোবাইলটা ফুড়িয়ে নিয়ে বললাম, ‘কে অসভ্য, হ্যাঁ? অসভ্যতা? কে? আর ভারী বয়ে গিয়েছে আমার তোমাকে ধাক্কা মারতে!’

মেয়েটা উঠে দাঁড়াল এবার। জামটা ঝড়ল হাত দিয়ে। তারপর বলল, ‘আর একটা কথা বললে না জুতো খুলে মারব। রাসকেল কোথাকার। স্কিরো!’

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা আমার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে গেট খুলে ঢুকে গেল আমাদের বাড়িতে।

দুই

গেট খুলে বেরিয়ে এল তোশানা। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সামান্য মোটা হয়েছে ও। চোখে চশমা। বাঁ হাতে একটা সরু খড়ি হাড়া আর কিছু নেই। তোশানা বেরিয়ে সোজা তাকাল আমার দিকে। চোখে চোখ রাখল সামান্য। যেন পদ্মপাতার জল।

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। চারদিকে মেঘ করে আছে। গোলপাড়ার রঙের আকাশ আজ যেন নিচুতে নেমে এসেছে অনেক। একটা নিভৃততা ছড়িয়ে আছে চারদিকে। মনে হচ্ছে গোটা পাহাটাই যেন ঘুবে রয়েছে জলের তলায়। যেন আর এই পৃথিবীতে কেউ নেই। যেন আর কেউ কোনওদিন থাকবেও না। শুধু তোশানা আর আমি দাড়িয়ে থাকব এমনই এক মেঘলা দিনে, মুখোমুখি, অনন্ত সময় ধরে।

তোশানা ধীর পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। এত বছর পরে এই প্রথম ওকে দেখলাম এত কাছ থেকে।

সেই চোখ। সেই সামান্য টোল-পড়া গুতনি। সামান্য চাপা নাকের পাশে খুব ছোট্ট এক ফোঁটা ডিম। দেখলাম, ওর বাদামি চোখের মণি। আর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া পথের মতো অসি। এত সাদা সিঁথি।

এতটা সাদা!

তোশানা এগিয়ে এল আরও কাছে। তারপর হাত দিয়ে আলতো করে ধরল আমার মুখটা। আমার দম বন্ধ হয়ে এল। বুকের ভিতর হিটকে উঠল দু’হাজার বদরি পাখি। মনে হল এবার নিকিত উত্তাপে গলে যাবে আমার কান, নাক। গলে যাবে আমার পাকুদের শেষ শব্দটুকি।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওই ঘেরেরি মাল্লেশ পাটার মতো চোখের মণি দুটোর দিকে। তোশানা এগিয়ে এল আরও...আরও...তারপর ওর চোঁট দুটো নিয়ে এল কাছে...ওর শ্বাস অনুভব করতে পারছি আমি। আমিও ধরলাম ওর হাত, তারপর আমার চোঁট দুটো সামনে নিয়ে গেলাম। আর ঠিক তখনই আবার চোখে পড়ল ওর সিঁথি। মুতের হাড়ের মতো সাদা, ফ্যাকাসে এক সিঁথি। আমি তাকালম ওর দিকে, আর দেখলাম, তোশানার সারা মুখে নীল সাপের মতো শিরা জেগে উঠছে ক্রমশ। চোখের মণি দুটো বদলে যাচ্ছে লাল রঙে আর চোঁট দুটো হরষে উঠছে গাঢ় বাদামি। এবার ওর চোঁট ফাঁক হয়ে গেল। আর নিমেষে জ্বাগনের মতো চোরা একটা জিভ বেরিয়ে এল আমার চোঁটের দিকে। আর ‘আঃ’ শব্দ করে আমি জেগে উঠলাম ঘুম থেকে।

কোথায় আমি? বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মাথা ফাঁকা। জিভ শুকিয়ে গেছে। আমি কোথায়?

‘দাদাভাই, কী হয়েছে তোর?’

আচমকা এই ভাকটা কাছ করল। প্যারামুপারের মতো আমার মাথার ভিতরে ফিরে এল সবেই। দেখলাম, তিনতলার ঘরের বিছানায় বসে আছি আমি। জানালা খোলা। সত্বর ঠিক আগের পার্পল রঙে ক যেন রাঙিয়ে দিয়ে গেছে আকাশটা। আর দেখলাম, আমার সামনে দাড়িয়ে উল্লসিতভাবে তাকিয়ে রয়েছে বিলু।

আমি হাত দিয়ে কপালটা মুছলাম। যেয়ে গেছে পুরো। এমনতিয়েই শিকড়ের ঠান্ডা থেকে এখানে এসে আমার শরীর হাঁসকাঁস করছে।

জান্নামতো এমন একটা স্বপ্ন। ওঃ! এটা কী দেখলাম আমি। কেন দেখলাম?

‘এই দাদাভাই, কী হয়েছে তোর?’ বিলু এগিয়ে এসে বসল আমার সামনে।

আমি হাত বাড়িয়ে পাশে রাখা বোতল থেকে জল খেলাম একটু। তারপর বিলুর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বিলু বলল, ‘কাল তো মোবাইলের সিম-টিম সব নিয়ে নিয়েছি, না?’

‘কেন?’ আমি মনটা সংযত করলাম। নিজেই বোঝলাম এটা শুধু একটা স্বপ্ন ছিল। এটা নিয়ে ভাবার মানে হয় না।

‘কারণ, বরুণা চাইছিল তোর নাথার। শুনেছে যে, তুই এসেছিস।’

‘বরুণ?’ আমি থমকালাম একটু, তারপরই বললাম, ‘ও পেরেক। ঠিক আছে আমিই দেব ওকে। দেখা করা হয়নি এখনও। তা, ও তো আসতেও পারত!’

বিলু বলল, ‘কে জানে কেন এল না। আসলে পালাটে গিয়েছে অনেক। বাই য় ওয়ে আমি যে-কারণে এলাম। তোমার শরীর ঠিক আছে তো? এই সময়ে ঘুমোচ্ছিস। বাবা বলল সেখান থেকে আসতে।’

আমি হাসলাম। বিছানা থেকে উঠে ফ্যানের শিডিটা দেখলাম একবার। নাঃ, ফুল শিড়েই ঘুরছে। কিন্তু তা-ও এত গরম লাগছে। একটা কুলার বসালে ভাল হত।

‘কী রে? শরীর ঠিক আছে তো?’

আমি বললাম, ‘বিলু, বিমি আ স্মার্ট গার্ল, তুই বুঝতে পারছিস না কেন ঘুমোচ্ছি?’

‘ও হ্যাঁ!’ বিলু জিভ কাটল, ‘বাবো ব্লক। এখন তো শিকাগোয় ভোর রাত।’

আমি বললাম, ‘একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি, কেমন?’

‘শিওর। আমি নিচে বান্দি। তুইও আর। বাবা তোকে ডেকেছে।’

আমি বললাম, 'একটা কথা বলি? আমি একটা কুলার লাগাতে পারি কি? মানে যা গরম!'

বিলু বলল, 'তুই ব্যাকবে জিচ্ছেস কর। জানিস তো বাবা কেমন! আর...'

'আর?' আমি বুঝলাম বিলু কিছু একটা জিচ্ছেস করতে চায়।

'একটা কথা জিচ্ছেস করব?' বিলু একটু যেন সতর্ক হল।

আমি একটা তোমালে নিয়ে কাঁখে ফেলে বললাম, 'বল, ফর্মালিটি করহিস কেন?'

বিলু তা-ও সময় নিল একটু। তারপর বলল, 'তোশানাদিকে এখনও তুই ডুলিসনি, নারে? ঘুমের মধ্যে ওর নাম করছিলি!'

বাথরুমটা আমি একা পরিষ্কার করেছি। শিকাগোয় যে স্টুডিওতে আমি থাকি, সেটা সবসময় বন্ধককে রাখি। আসলে সামান্যতম নোরাও আমার পছন্দ নয়। ও দেশে যেরকম সব নিজেকেই করতে হয়, তাই এসব করতে আমার অসুবিধে হয় না।

বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে বেরিয়ে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। তবে এত পলিউশন যে-আকাশের উজ্জ্বল তারা ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমি এবার সামনের দিকে তাকালাম। এখান থেকে বিদ্যাসাগর সেতুটা এখনও দেখা যায়। তবে ক'দিন দেখা যাবে কে জানে। কারণ, পলিকডমের বাড়িটা ভেঙে ওখানেই তো একটা মাস্টিস্কোরেরড বিল্ডিং হচ্ছে।

আমি ঘরে ফিরে গায়ের জামাটা পালালাম। এটা ঘামে ভিজে গিয়েছে একদম। তারপর মানিবাগ আর মোবাইলটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করলাম। কাকুর সঙ্গে কথা বলে একটু ক্যাফেতে যাব। এখানে আমার নেট কাজ করছে না। একটা প্রিন্ট আউট নিতে হবে। আসার তাড়াহুড়োয় নিয়ে আসতে পারিনি প্রিন্ট আউটটা। মোবাইলের যে কানেকশন নিয়েছি, তাতেও নেটটা এখনও চালু করেনি।

আমার যে কী হরিবল লাগছে সব কিছু। মনে হচ্ছে দশ বছর আগের শহরটা যেন আরও পিছিয়ে পড়েছে। লোকগুলোও যে আরও ক্যালাস আর ফুঁড়ে হয়ে গিয়েছে। শুধু যেনতেন প্রকাণ্ড পুরনো রোজগার, ছোট একটা গাড়ি, ব্র্যান্ডের ইএমএম, বড় বড় মোটরসাইল, আর ঘরে বসে দায়েরীনে নেট-ব্রাউজিং। এতেই যেন জীবনের মোক্ষলাভ হবে এদের। কলেক্স লাইফ বাসে উঠে যেমন গুনতাম কভার্টারটা চেষ্টায়ে বলছে, 'পিছনের দিকে এগিয়ে যান।' এখানেও বোধহয় তেমনই কোনও এক অদৃশ্য কভার্টার একই কথা বলে চেষ্টায়ে চলেছে সমানে।

মোড়ালার আঙ্গ সব আলো জ্বলছে। দেখে অবাক লাগল। কাকু একদম অশচয় পছন্দ করে না। মনে, অভ্র ভাষায় কাকুকে সকলেই বলে হাডকিপটে। সব কিছুতেই কাকু দরকারের চেয়ে কম খরচ করে। সত্যি জিনিস কিনে তাকে যতটা পারা যায় ব্যবহার করে তবেই ছাড়ে। তো, সেই লোক আঙ্গ সারা বাড়ির আলো জ্বালিয়ে রেখেছে কেন?

আঙ্গ আর বিলুর ঘরে গেলাম না। সিঁড়ির পাশের ঘরটা বসার জন্য। আর সেখান থেকেই কথা ভেঙ্গে আসছি। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম দরজার কাছে। তারপর আলতো করে টোকা দিলাম।

'কে? কহু?' কাকু বলল, 'আরে, দরজায় দাঁড়িয়ে কী করহিস? ভিতরে আয়।'

আমি ভিতরে ঢুকলাম। দেখলাম, কাকু আর কাকিমা ছাড়াও ঘরে একজন ভ্রমলোক আর ভ্রমহিলা বসে রয়েছেন।

কাকু বলল, 'আরে বোস। বিলু বলল তুই নাকি ঘুমোছিলি? কী হচ্ছে? শরীর খারাপ? এমন সময় ঘুমোছিলি কেন?'

আমি একটা বেতের চেয়ারে বসলাম। তারপর বললাম, 'আসলে ওখানে এখন তো ঘুমের সময়। তাই মানে... শরীরের মানিয়ে নিতে তো একটু সময় লাগবেই।'

'তাই?' এবার ভ্রমলোক কথা বললেন, 'এখন ওখানে ক'টা বাজে?'

আমি হাসলাম। মনে-মনে বিরক্ত হলেও সেটা তো আর লোকের সামনে বের করা যাবে না। এখানে এসে ইন্তক দেবাছি পরিচিত কেউ দেখা হলেই যে-চারটে প্রশ্ন করবে, তার মধ্যে এই প্রশ্নটা থাকবেই। 'এখন ওখানে ক'টা বাজে?' কে জানে এটা জেনে এখানকার মানুষের কী হবে? যদি মেলাবে? ঘুমোবে? নাকি ট্রেন ধরতে যাবে? যা জানলে জীবনে কাজে লাগবে তা জানার নাম নেই। শুধু হাবিজাবি বিষয়ে প্রশ্ন।

আমি ভ্রমলোককে ভাল করে দেখলাম। খুব মোটা। মাথায় বেতুনি রং কটা চুল। হাতে তাগা, আঙঠি মিলিয়ে বোধ হয় যারোটা জিনিস। তার মধ্যে দু'-একটা তাগা এত পুরনো যে, লীলা মজুমদারের সেই গল্পের মতো সেগুলো বোধ হয় মাঝে-মাঝে উনি চুলকেও ফেলেন। পাশের ভ্রমহিলা যে ওঁর ত্রী সেটা বলে দিতে হয় না। এমনিই বোঝা যাচ্ছে। ভ্রমহিলাও বেশ মোটা। আর কত গরমা পরে এসেছেন। এখনকার দিনে রাস্তাঘাটে কেউ এমন জুয়েলারি শপ হয়ে বেগোয় নাকি।

আমি হেসে সমস্রটা বললাম।

কাকু বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার রমেন গাঙ্গুলি। আর উনি ওঁর ত্রী। টিয়াদি।'

আমি হাতছোঁড় করে নমস্কার করলাম।

কাকু সামান্য বিরক্ত হল, 'এ কী। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।'

এটা তোর হুঁ শব্দ-শাওড়ি।'

আমি আঁচড়ে গেলাম। আমার হুঁ শব্দ-শাওড়ি। আমিই

জানি না এদিকের এঁরা আমার শব্দ-শাওড়ি হয়ে বসে আছেন?

আমি বিব্রত হচ্ছি দেখে রমেন বললেন, 'আরে, ওসব ব্যাঘ দাও।'

বিসেলে থাকা মানুষ। ওসব আর করিতে হবে না। আর আমরা খুব

জি-ওসব প্রকাশ-উন্মাদে বিব্রাশ করি না।'

আমি আর চেপে থাকতে না পেয়ে বলে ফেললাম, 'কীসে করে?'

রমেন ঘাবড়ে গেলেন, 'কিস? মানে চুমু?'

'আরে না না, কাকু বিব্রত হল এবার, 'আর কীসে কীসে...'

'কিস মানে তো চুমুই?' এবার টিয়া মাকে অবতীর্ণ হলেন, 'বিসেলে কি শব্দ-শাওড়িরাও কিস করে?'

সর্বনাশ। এরপর কী বলবে এঁরা। ব্যাপারটা খুব বেঁটে যাচ্ছে দেখে আমি বললাম, 'আমি বলছি, আশনার কী ব্যাপারে বিব্রাশ করেন।'

'ও, তা-ও ভাল,' রমেন তাঁর বেনে চুলে হাত বুলিয়ে বসি পেলেন, 'আসলে তুমি তো বিদেশে থাকো। তাই ভাললাম ইয়ে আর কী। আসলে আমার ছোট ভাইয়ের শালাও থাকে বিদেশে।'

এই সেরেছে। এই আর-এক বিশদ। লভায়-পাডায় কে বিদেশের কোথায় কোথায় সেটা নিয়ে গল্প বলার প্রতিযোগিতা করে এখানকার বেশির ভাগ মানুষজন।

'কোথায় থাকে স্যার?' কাকু দেখলাম হাতে অদৃশ্য ফুল আর বেলপাতা নিয়ে মুখ হয়ে তাকাল রমেনের দিকে।

'ওই যে কোথায় যেন,' রমেন পাশে বসা টিয়ার দিকে তাকালেন, 'সেই যে গো, ওই জায়গাটা।'

টিয়াও চিন্তিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইখানে।'

'আরে ধ্যার, কোনখানে?' রমেন বিরক্ত হলেন।

আমি সাহায্য করতে বললাম, 'স্টেটসে কোথায়?'

'স্টেট? না না ইন্ডিয়ার বাইরে।' রমেন বললেন, 'আরে,

এখানকার কোনও স্টেটে না।'

আমি কাকু-কাকিমার দিকে তাকালাম। দেখলাম, দু'জনে এখনও সমান মুখ রমেনবাবুর ভূগোলের জ্ঞান দেখে। কী বিশদে কাঁদাময় রে বাবা।

কাকু আমায় বলল, 'রমেনবাবু আসলে আমার স্যার। আমাদের

অফিসে রিজিওনাল ম্যানেজার। খুব জ্ঞানী মানুষ।

‘আরে, তুমি বলো না, জায়গার নামটা মনে করতে পারছ না?’
রমেন জ্ঞানীটা ঠিক মনে করতে না পারার বিরক্তি নিয়ে টিয়ার দিকে
তাকিয়ে ষিটিয়ে উঠলেন।

টিয়া বললেন, ‘ওই যে, যেখানে ক্রিকেট খেলে।’

আমি আবার বললাম, ‘ইংল্যান্ড?’

‘না না সেটা নয়,’ রমেন চিড়বিড় করে বললেন, ‘পূজা থাকলে
ঠিক বলে দিত।’ আরে, যেখানে ওই অজুত প্রাণীগুলো পেটে বাচ্চা
নিয়ে লাফায়।’

ভগবান! এরা কারা! কীসব বলছেন। আমি বললাম, ‘অস্ট্রেলিয়া?’
‘হ্যাঁ, রমেন প্রচণ্ড খুশি হলেন, ‘ওখানেই।’

টিয়া আর কথা বাড়াতে গিলেন না। বললেন, ‘রুকু, তোমায় রুকু
বলি?’

আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

উনি বললেন, ‘পূজা আমার মেয়ে। তোমার কাকু ওর কথাই
তোমায় বলেছেন। ও ‘মাস কম’ নিয়ে পড়েছে। তারপর এখন ডাবছে
ডিসটার্শে এমএ করবে।’

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। কাকু গত দু’মাস আগে হঠাৎ
আমার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে। তারপর ফোনে নানা কথার ফাঁকে
এই নিয়েও কথা বলেছে বটে, কিন্তু আমি এখানে আসার পরে যে
সভা ব্যাপারটা নিয়ে কাকু এগিয়ে যাবে সেটা বুঝতে পারিনি।

কাকু বলল, ‘আরে, আমি ওকে সব বলেছি। ও তো বিয়ে করবে
বলেই এবার এসেছে।’

আ্যা? আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমি বিয়ে করব বলে
এসেছি? এদিকে আমিই সেটা জানি না। আমি তো মূলত এসেছি
ডিসার্মিনিটি করতে। আর একটা ব্যক্তিগত কাজে। কিন্তু বিয়ের
ব্যাপারটা তো জানতাম না।

আমি বললাম, ‘আসলে আমার ডিসার্মেডান ফুরিয়েছে। এখানে
এসেছি রিনিউ করার বলে। তার সঙ্গে দু’-একটা কাজ আছে ব্যক্তিগত
সেকুলোও মেটাতে হবে।’

‘তাই তো বলছি।’ কাকু হাসলেন।

রমেন জিজ্ঞেস করলেন, ‘ডিসা পাবে তো?’

‘হ্যাঁ, পাব। ব্যাক্তে টাকাপয়সা সব জমা হয়ে গিয়েছে।’ উই-ও
পেয়ে গিয়েছি। সেন্ট উইকে যেতে হবে ইন্টারভিউয়ে। তারপর পেতে
যে-ক’টা দিন লাগবে।’

‘ভবে মাসে দিন ঠিক করি। পৌষ মল মাস। কাজ হবে না। আর
এখন থেকেই সব ঠিক করতে হবে। না হলে বিপদ। বাড়িভাড়া পাওয়া
যাবে না,’ টিয়া টেনসড গলায় বললেন।

রমেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, ‘আর, তুমি কী নেবে
আমরা বোলো। মানে, বিয়ের পর ইউ নিয়ে তো তুমি ওদেশেই যাবে।
তাই ভাবছি কিছু জিনিস না দিয়ে থোক টাকা দিয়ে দেব। তাতে
তোমাদের দু’জনেরই সুবিধে।’

‘দাঁড়ান,’ আমি আর পারলাম না, ‘এসব কী বলছেন? কে বলল
আপনাকে আমি কিছু নেব?’

‘ও, তুমি কি পণপ্রথার বিরুদ্ধে? আমি তো পণ সিদ্ধি না। মেয়েকে
সিদ্ধি।’

‘আরে, আমার কথাটা শুনুন।’ আমি নিজেকে যথাসম্ভব সংযত
রেখে বললাম, ‘আমার টেরিগ্নি বছর বয়স। সেখানে আপনার মেয়ে
তেইশ। ব্যাপারটা ভাবুন। আর বিয়ে করাটা তো খুব ব্যক্তিগত
ব্যাপার। এভাবে হয় নাকি। দেশুন, দশ বছর অন্য একটা দেশে, অন্য
একটা কালচারে সম্পূর্ণ একা আছি আমি। সেই আগের রুকুটা কিন্তু
আর নেই। থাকাও সম্ভব নয়। আমার মনের, অভ্যাসের অনেক কিছু
বদল হয়েছে। ভাল বা খারাপ হিসেবে নয়, এমনিই বদল ঘটেছে। তাই
আপনারা স্লিক আগে থেকে কিছু ভেবে নেবেন না। জানি না কাকু কী
বলেছে আপনাদের, কিন্তু আমি বিয়ে করব কি না সেটা একান্ত আমার

ব্যাপার। আর কারও নয়।’

আমি কথা শেষ করা মাত্রই রমেন পাথরের মতো হয়ে গেলেন
নিমেবে। তারপর কাকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এর মানে কী?
আমায় ডেকে এনে এভাবে অপমান করলেন।’

কাকু কী বলবে বুঝতে না পেরে তাকাল আমার দিকে।

কাকুমা এতক্ষণ প্রথম কথা বলল। বলল, ‘তুই কী বলছিস রুকু?
কাকু তোকে গত কয়েকমাস ধরেই তো এ ব্যাপারে বলছে। তখন তো
এসব বলিসনি।’

আমি কাকুমােকে বললাম, ‘আমি পজিটিভ কিছুও বলেছি কি?’
তারপর রমেনের দিকে তাকলাম, ‘শুনুন, কাকু আপনাকে অপমান
করেননি। আমিও করছি না। শুধু বলছি বাস্তবতা বুঝতে। আপনার
মেয়ের সঙ্গে আমার বয়সের পার্থক্যটা বুঝেছেন।’

টিয়া বললেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি আগে পূজার সঙ্গে
সেবা করো। তারপর দেখো, তোমার ওকে ভাল লাগবে। আর ও তো
সব জেনেই আগ্রহী।’

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়লাম। ডবি ভূগিবার নহে। বললাম,
‘আমার একটা কাজ আছে। আচ্ছা আসি।’

টিয়া বললেন, ‘আমি তাহলে একটা ভাল দিন ঠিক করে জানাব।’

তুমি ওর সঙ্গে বাইরে কোথাও দেখা করে নিয়ো। আমরা এসব
ব্যাপারে খুব মর্জান। দেখো, তোমার কোনও প্রবলেম হবে না।’

রাস্তায় বেরিয়ে আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ওঃ, পাগলা গারদ
পুরো। আর কাকু নিজের বসকে খুশি করতে আমায় কেন বলি দিতে
চাইছে কে জানে। বসকে কি খুশি করার অন্য কোনও উপায় নেই?
বড়শাখার কাছে একটা ক্যাফে আছে। গতকাল দেখেছি। সেখানে
প্রিন্ট আউট নেওয়া যায়। আমি সেই দিকে পা বাড়লাম। ডিসার
দরকারী পেশার ছাড়াও আর-একটা ই-মেলের প্রিন্ট আউট নেওয়াও
আমার খুব জরুরি।

পাড়াটা এই ক’বছরে খুব একটা পালটায়নি। শুধু কয়েকটা পুরনো
বাড়ি আর নেই। বাকিটা সেই একই রকম রটো আর খাপসা রয়ে
গিয়েছে।

বাড়ির গলিটার মুখের কাছেই পিছন থেকে সেই অজুত ঘণ্টাটা
শুনতে পেলাম। ফ্রুত পিছন ফিরে দেখলাম, ষিটকমল। আগের
চেয়েও বড়ো হয়ে গিয়েছেন মানুষটা। কিন্তু সেই সাইকেলটা ছাড়েননি
এখনও। আশ্চর্য!

মাফলারে কান-মাথা ঢেকে সাইকেল করে আসছেন কমল
ডাক্তার। আমি এক পাশে সরে দাঁড়লাম। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়
আমার দিকে তাকালেন একবার। সেই ঘোলাটে, বিরক্ত দৃষ্টি। এই
লোকটার পৃথিবীর সব কিছুতেই এতে বিরক্তি কেন কে জানে।

রাস্তায় পাশেবলর বাঁশের কাঠামোটা খোলা হচ্ছে আছে। রাস্তাটা
এমনিভেই সর, তার ওপর এই সব বাঁশ, খুঁটির জন্য যেন একফালি
হয়ে গিয়েছে। আমি সেই জায়গাটা পার করে এগিয়ে গেলাম।
সামনেই সর গলি। এটা দিয়েই বড়রাস্তায় ওঠা যায়।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সারা পাড়ায় এখন ওই তিন থাক
আলোগুলো লাগলেও, এই গলির দু’পাশে সেই আগের মতোই
অন্ধকার হয়ে আছে। হয়তো সর গলি বলে আলো লাগানোর জায়গা
পায়নি। বা লাগলেও হয়তো ভেঙে পড়েছে কেউ।

চওড়া একটা রাস্তা দিয়ে পাড়া থেকে মেন রোডে যাওয়া যায়
বটে, কিন্তু পাড়ার সকলে এই শর্ট কাটটাই ব্যবহার করেন। একটা
রিকশা বা অটো কষ্ট করে চলে যেতে পারে এই গলি দিয়ে।

গলিটা দেখে বুকের ভিতরটা আচমকই কেমন যেন চমকে উঠল।
চোখের সামনে ভেসে উঠল পুরনো কিছু মোম-কাগজের দৃশ্য। নির্জন
রাস্তা, একটা চৌটা। ভবে কি আবার পরদার পাবহার এখনও বেঁচে
আছে কেউ? তাই কি সে খন্ডে ফিরে-ফিরে আসে? আসলে আমরা
মাঝে-মাঝে নিজেরাই নিজেরদের চমকে দিই। আমাদের ভিতরে যে

আর-একটা আমি থাকে, সেটা এমন ছোট মুহূর্তগুলোয় বৃথতে পারি।
বড়াস্তার মুখেই একটা বিশাল দোকান। ইটারনেট ক্যাফের সঙ্গে
ডিটিপি, ফোটোকপি, ল্যামিনেশন, স্পাইরাল বাইন্ডিং, সব কিছুই
দোকান।

আমি নামটা দেখলাম, 'নিরঞ্জন সারদেশাই মাশ্টিপল সেন্টার।'
বড় কাচের দরজার ওপাশে বেশ কিছু মানুষ রয়েছে। ভিড় দেখে
বুখলাম এখানে সময় লাগবে। দেখলাম, কাচের দরজায় কাগজের
নোটিশ—'প্লিজ ওপেন ইয়ার শু অ্যান্ড এন্টার।'

ওপেন! সর্বনাশ! এ যে ইংরেজিতে বৃহস্পতি! আমি জুতো খুলে
দোকানে ঢুকলাম।

'আরে রুকুনা! তুমি!'
আচমকা পাশ থেকে একটা মেয়েলি গলার স্বর শুনে চমকে উঠে
তাকালাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভিতরে দু'লক্ষ ফড়িং ডানা কাপিয়ে
উড়ে গেল যেন।

দেখলাম, আমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীতল।

॥ ২ ॥

'ইফ উইটার কামস ক্যান স্ট্রিং বি ফার বিহাইন্ড?' কথাটা বলে শীতল
হাসল পেরেকের দিকে তাকিয়ে, তারপর বলল, 'আমি এসেছি যখন,
তখন একটা পরে মিলিও আসবে!'

পেরেক মাথা নাড়ল, 'তোদের নিয়ে আর পারি না মাইরি। কে
বলেছে তোদের নাটক করতে? নিজেরাই তো বলেছিল যে, পুজোয়
নাটক করবি। সেই শুনে পাড়ার মোড়ে স্টেজ-ফেজ করার কথা
বললাম, আর এখন তোদের রিহাস্যালের পাভা নেই! সত্যি! না
মিলিয়ে ছাড়বি না দেখছি!'

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সদ্য টিউশন থেকে ছাত্র ঠেঙিয়ে
ফিরেছি। পুজোর সময় ক'দিন টিউশন বন্ধ থাকবে বলে এখন এক্সট্রা
ক্লাস নিতে হচ্ছে!

সারাদিন কলেজের পর সন্ধ্যাবেলা যেদিন এই ক্লাস নেওয়া থাকে
সেদিন আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। এমনতেই আমার
সেলিমের প্রবলেম আছে, আর এই শরতে সেটা বাড়ি। পলিউশন
আর শেষ বর্ষার বাষ্প মিলিয়ে যে-জিনিসটা কলকাতার হাওয়ায় মুখের
সরের মতো পড়ে থাকে, তাতে প্রায়দিনই আমার শরীর খারাপ করে।
আজ সেই শ্রায় দিনের একটা দিন।

আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছলাম। নাকের
ভিতরে মনে হচ্ছে পিঁপড়েরা প্যারেড করছে। মনে হচ্ছে কপালে পার্ক
সার্কাস সেভেন পয়েন্টসের ট্র্যাক্সিক ক্যাম লেগে গেছে। চোখে কেউ
যেন লজা ঘষে দিয়েছে। এই অবস্থায় ক্লাস নেওয়া যে কী বিভীষিকা,
যার হয়-সেই-এই।

শীতল লাইব্রেরির দিকে চলে গেল। আমাদের পাড়ার লাইব্রেরিটা
অনেক পুরনো। প্রায় পঁচাত্তর বছরের তো হবেই। সেই লাইব্রেরির
একতলাটা পুরো ফাঁকা। সেখানে বিয়ে-অন্নপ্রাশন-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান
থেকে শুরু করে পাড়ার ছোটদের কালচারাল প্রোগ্রাম, সবই হয়।
বুখলাম, নাটকের রিহাস্যাল ওই লাইব্রেরিতেই হবে। কিন্তু শীতল
মেয়েটা কে?

আমি রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ রে পেরেক! শীতল
কে?'

পেরেক কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে বলল, 'পুরো আতা হয়ে
গিয়েছিস। নাকি রাতদিন এই ফ্যাচফ্যাচ করতে-করতে ঘিনুগুলো সব
সর্দির সঙ্গে বেরিয়ে গেছে?'

'তুই একটা কথারও সোজা উত্তর দিস না কেন রে?' আমার মাথা
গরম হয়ে গেল, 'দ্যাখ, আমার পড়া আছে, আরও নানা কাজ আছে।
বিদেশে যাওয়ার পরীক্ষার জন্য আলাদা টিউশন নিচ্ছি। তোর মতো
সমাজসেবক হয়ে থাকলে আমার হবে?'

পেরেক বলল, 'সমাজসেবা নয়। কিন্তু দ্যাখ, সকলেই যদি নিজের
কাজটা নিয়ে থাকে, তাহলে সকলের কাজটা কে করবে? কমন কিছু
কাজ তো থাকেই সমাজে, সেগুলো কে করবে?'

আমি উঠে পড়লাম, 'শালা, মেয়েটা কে জিজ্ঞেস করছি তাতে
এত লেকচার শুনতে হবে জানতাম না!'

নৈকে আমার হাত ধরে টেনে বসিয়ে মিল, বলল, 'বোস, বোঁচা
ভেজিটেবল চপ আনছে। অর্ডার দিগেছি। ওই মেয়েটার নাম শীতল
মিত্র। পাড়ার ওই দিকে, মানে গোবিন্দ ব্যানার্জির বাড়ির দিকে ওরা
বাড়ি কিনে এসেছে দু'মাস হল। দুই বোন। বাবা ব্যস্তের ম্যানেজার।
তুই যেমিনসি?'

'না, কখন দেবব? আমি আবার রুমাল বের করলাম।

পেরেক কিছু বলার আগেই ভেজিটেবল চপ দিয়ে গেল বোঁচা।
একটা থার্মোসেরে প্লেটে চারটে চপ। সঙ্গে একটা কাসুন্দি। আমার
বিশে পেয়েছিল বেশ। তাই দ্রুত দুটো চপ খেয়ে নিলাম। আমি জানি
না বাড়িতে গেলে কপালে কিছু স্বেচ্চে কি না!

চপটা বেশ ভাল। তবে সর্দির মুখে ভাল লাগল।

পেরেক বলল, 'দুটো না, তুই তিনটে খা। আমি একটাই খাব।'
আমি বললাম, 'কেন?'

'খা না!,' পেরেক একটা চপ হাতে ধরিয়ে মিল আমায়। তারপর
বলল, 'তোকে একটা কথা বলি? কিছু মনে করবি না তো?'

'কী?' আমি দেখলাম পেরেকের মুখটা সতর্ক হয়ে উঠেছে হঠাৎ।
পেরেক বলল, 'না, আগে তুই বল কিছু মাইন্ড করবি না।

তাহলেই বলবা!'

আমি তিন নম্বর চপটা শেষ করে হাত বাড়লাম। তারপর বললাম,
'বল, আমি শুনিছি।'

'কাকু মানে, তোর বাবা,' পেরেক পুলকিতদের ব্যারান্দায় ভাল
করে বসল, 'মানে, সেদিন এমন একটা জায়গায় দেখলাম যে...ইয়ে..'

মানে হল কেউ যেন আমার শিরদাঁড়ার গোড়ায় ইলেকট্রিকের
খোলা তার ঝুঁিয়ে দিয়েছে।

পেরেক সাবধানে বলল, 'সেদিন টালিগঞ্জ ফড়ির ওমিকে
গিয়েছিল। মানে, আমাদের শ্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হয়ে একটা নাইট
বুস খোলা হবে মহাবীরতলার ওমিকে। তার জন্য একটা ঘর দেখতে
গিয়েছিল। তখনই দেখলাম ব্যাপারটা।'

'কী দেখলি?' আমার কেমন যেন শরীর খারাপ করছে। কী শুনতে
হবে কে জানে। আমার বাবা লোকটাকে আমার পছন্দ নয়। কিন্তু
তা-ও অনের মুখ থেকে বাবার সংকেত কিছু শুনতে ভাল লাগে না।
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ট্যাঙ্কেই হল, জীবনে আমাদের এমন অনেক
কিছু সম্পর্ক নিয়ে চলতে হয় যেগুলো বাহার অধিকার আমাদের
নিজদের হাতে থাকে না।

'ওখানে একটা গলির ভেতরে গিয়েছিল। সেখানেই দেখলাম
কাকুকে। একটা বড় চালার ঘর থেকে বেরোচ্ছে। আসলে জায়গাটা
খুব একটা ভাল নয়। একটা শেডি। আর কাকু যেখান থেকে
বেরোচ্ছিল সেটা একটা স্টায়ার ঠেক।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। চোয়াল শক্ত করে মাথা
নামিয়ে নিলাম শুধু।

পেরেক বলল, 'ওই ঠেকটার যে পেনসিলার তার নাম জগা। আমি
চিনি। লাইট মাঠে আসে মাঝে-মাঝে। ভাল গান করে। তা, ওকে
জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, কাকু নাকি প্রায়ই ওখানে যায়।'

আমি মুখ তুললাম এবার, দুর্বল গলায় বললাম, 'আমি এটা
জানতাম না।'

পেরেক কাঁধে হাত রাখল আমার। তারপর বলল, 'দ্যাখ, আমাদের
বড়ার কী করবে সেটা তো আমাদের কষ্টেই নেই। কিন্তু যখন
জানলি কাকুকে একটা বলিস। জানিস তো, এসব দেশার কোনও শেষ
নেই। মানে, এসব আশ্বনের মতো হয়। পুরো গিলে নেয় মানুষকে।
বলিস কাকুকে।'

আমার বুকের ভিতরে কেমন যেন ছালা করে উঠল। আশুনটা কি তবে আমার মধ্যেই লাগল।

আমি উঠে পড়লাম, বললাম, 'বাড়িতে যাই, ভাল লাগছে না রে।' পেরেক বলল, 'শোন, রাগারাগি করবি না। ভাল করে, ঠান্ডা মাথায় কথা বলবি।'

আমি জানি আমার কী করতে হবে। পুরো ব্যাপারটাকেই হজম করে যেতে হবে। এমনভেই গোটো বাড়িতে মাইন পাতা। তার মধ্যে এসব বললে আর রেহাই নেই।

আমি মাথা নিচু করে ব্যাঙ্গাল থেকে ব্যাগটা তুলে পা বাড়াতে গেলাম, আর ঠিক তখনই বিপশিটটা ঘটল আবার।

মনের অবস্থা তো ভেঙে পড়া বাড়ির মতো, তাই কোনওদিকে খুব একটা ঝেঁয়াল ছিল না। ফলে ব্যাগ নিয়ে ঘুরেই আজ্ঞা আবার দড়াম করে থাকা খেলো।

'ওঃ, মাগো!'

আমি অনেক কষ্টে টাল সামলে নিয়ে দেখলাম, আমার সামনে মাথা চেপে ফুটপাথে বসে পড়েছেন একজন ভদ্রমহিলা। আর পাশে একটা মেয়ে।

'আবার তুমি? আজও?' মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে ঝাঙ্কিয়ে উঠল।

'আ-আমি দেখতে পাইনি। সতি।' আমার মাথাতেও ভালই লেগেছে।

'কেন? চোখ পকেটে নিয়ে হাঁটো? অসভ্য একটা। রাস্তায় মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে বেরোও? রাসকেল।'

এবার আমি চিনতে পারলাম। আরে। সেই মেয়েটা তো। একেই তো সেদিন বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলাম।

মেয়েটা এবার ভদ্রমহিলার পাশে হট্ট গেড়ে বসল। বলল, 'মা, খুব লেগেছে? কোন অঙ্গের পাড়ায় বাছ গিয়ে এসেছে তোমরা? তখনই বলেছিলাম পাড়াটা আমার পছন্দ নয়।'

আমি ভদ্রমহিলার হাত ধরতে গেলাম, 'আসুন স্নিগ্ধ। আমি দেখতে পাইনি। শরীরটা ঠিক ভাল নেই...'

ভদ্রমহিলা হাতটা ঝটকা মারলেন, 'নেশা করেছ নাকি? এভাবে কেউ রাস্তায় হাঁটে? চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব জানোয়ার!'

আমি খতমত খেয়ে দাড়িয়ে রইলাম।

'আরে কার্কিমা, রাগ করবেন না স্নিগ্ধ, এবার পেরেক এগিয়ে এল, 'রুকুও সতি শরীরটা ভাল নেই। ওকে স্নিগ্ধ ক্ষমা করে দিন!'

ভদ্রমহিলা উঠে দাড়িয়ে পেরেককে দেখলেন। তারপর বললেন, 'শরীর ভাল নেই তো কমলদার নার্সিং হোমে ভর্তি হলেই পারে! এমন মাতালের মতো রাস্তায় ঘোরো কেন? চল পুপু!'

মেয়েটা আমাদের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'মা, তুমি যাও, আমি আসছি।'

ভদ্রমহিলা আমার দিকে আবার বিরক্ত দৃষ্টি ছুড়ে আন্তে-আন্তে চলে গেলেন।

পেরেক অবস্থাটা সহজ করার জন্য বলল, 'রুকু, এই শীতলের পিদি, তোশানা! আর তোশানা, ও রুকু!'

আমি আমার ব্যাথা জায়গাটা ঘষে বললাম, 'রুস্বিগীকুমার মূবোপাধ্যায়।'

তোশানা আমার দিকে তাকাল এবার, তারপর বলল, 'তোমার ব্যালেন নেই, না? সেদিন আমায় ধাক্কা দিলে। আজ মাকে ঝুতোলে! কোন খেয়ালে থাকো?'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। মাথার ভিতরটা কেমন যেন ফাঁকা ব্র্যাকবোর্ডের মতো হয়ে আছে। আমি শুধু তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। আর জীবনে প্রথম বৃথলাম মাথা ফাঁকা হওয়ার উপকারিতা।

তোশানার ছোট কপাল, আলতো টোল-পড়া খুতনি, সামান্য চাপা নাক, নাকের পাশে ছোটতম কালো ডিল আর মুক্তার মতো

দাঁতগুলো সব নিবুতভাবে আঁকা হয়ে থাকছিল ওই ফাঁকা বোর্ডটায়! তীক্ষ্ণ সুন্দরী না হলেও কাউকে দেখলে যে মনের মধ্যে এমন পিয়ারমিটের তুবরাপাত হতে পারে, আমি এই প্রথম জানলাম! বাড়ির সমস্যা। বাবার সাটোর ঠেকে যাওয়ার খবর। শরীর খারাপের কামড়। সব সেই নিমেষে ঢাকা পড়ে গেল সেই তুবরার তলায়। আমি তোশানার ছোট্ট গোলপিশি ছোট্ট দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল, আমাকে যদি আরও বকতে ইচ্ছে করে ওর, বকুক না। ক্ষতি নেই।

আমি দেখলাম, তোশানা এখনও হাত নেড়ে কত কী বলে যাচ্ছে। কিন্তু আমার কানে কোনও কথাই ঢুকছে না। আমি শুধু ওর হাতটা দেখছি। এত সুন্দর কী করে হয় কারও হাত? কী দিয়ে তৈরি হাতটা? আর চামড়ার তলায় কি ফুরোসেন্ট আলো ছলছে। আমি বৃথলাম কোনও-কোনও খেয়ে বোধহয় জোনাকির প্রপাটি নিয়ে জন্মায়। 'কী হল? কথা কানে যাচ্ছে না?' তোশানা এবার মুখের সামনে জোরে হাত নাড়াল।

আমি খতমত খেয়ে বললাম, 'না, মানে হ্যাঁ।'

'এটা কে রে পেরেক? কোন ডাইমেনশনে থাকে? রোজ দেখি মাথা নিচু করে কলেজে যায়। বাসস্টপে দাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবার কথা বললে উত্তর দেয় না। আমি যে ওদের বাড়িতে পড়াতে যাই ওর বুড়তুতো বোনকে, সেটাও জানে না।' তোশানা ডডবড় করে বলে গেল কথাগুলো।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার তবে দ্যাচ্ছে মেয়েটা। আর আমার বোনকে পড়াই? হবে বা! আমি তো বাড়িতে কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলি না। তাই ঝেঁয়াল করি না।

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। তা-ও বললাম, 'আমি ইচ্ছে করে ধাক্কা দিচ্ছি। সেদিনও না, আজকেও না। তবে আয়াম সরি। আর হবে না।'

তোশানা এবার হেসে ফেলল, 'ঠিক আছে। অত বলতে হবে না। আমি থাকুর কাছে শুনেছি তোমার কথা। তুমি খুব ভাল স্টুডেন্ট। উচ্চ মাধ্যমিকে নাকি স্ট্যান্ড করেছিলো। এখন সায়েন্স কলেজ থেকে বি টেক করছ। শিগগিরই নাকি বিশেষ চলে যাবে।'

আমি থ মেয়ে তাকিয়ে রইলাম। তোশানা আবার হাসল। বলল, 'আসলে কে আমায় ধাক্কা দিল সেটা জানতে হবে না?'

পেরেক বলল, 'হ্যাঁ তোশানা, সবই ঠিক বলেছিল। রুকু খুব ভাল ছেলে। মানে, যাকে বলে আইডিয়াল ভাল ছেলে। কিন্তু কাকের নয়। যাক গে। তুই এই যে সেট করলি, রিহার্সাল যাবি না? দ্যাখ, এমনভেই পুজোর বাজেট নিয়ে টানাটানি, তার মধ্যে ফালতু খোলাস না। স্টেজ, লাইট, সাউন্ড করতে যা খরচ হবে সেটা বেঁচে গেলে পরের বছরের জন্য পুজোর ফাতে কিছু রাখতে পারব।'

তোশানা বলল, 'আরে, তুই ফালতু টেনশন করিস না। সব ঠিক হবে।'

আমি দেখলাম, আর আমার এবানে থাকার মানে নেই। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকটা মুছে বাড়ির দিকে পা বাড়লাম। 'আরে রুকু, তুমি চলে যাচ্ছ? তোশানা পিছন থেকে ডাকল আমায়।

আমি ঘুরে বললাম, 'হ্যাঁ, কাল একটা ক্লাস টেস্ট আছে। পড়তে হবে।'

তোশানা হাসল, 'এত পড়াশোনা করে কী হবে?' পেরেক বলল, 'ওকে যেতে দে। আমার বন্ধু হলো পাড়ার কিছুতেই খুব একটা থাকে না। তুই চল লাইব্রেরিতে। আর দেরি করিস না।'

পেরেক তোশানার হাত ধরে টেনে লাইব্রেরির দিকে এগিয়ে গেল। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দু'মাসেই পেরেকের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছে। আমার বুকের ভিতরে ছোট্ট একটা হারপাশা কামড়াল!

১৬৮। শারদীয় দেশ । ১৪

আমি ছাড়া নিয়ে বেরোইনি। আসলে ওখান থেকে আসার সময় নভেবরের কলকাতায় যে ছাড়া আনতে হবে সেটা ভাবতেই পারিনি। কনসুলেটের সামনে থেকে হেঁটে কিছুটা এগিয়ে এলাম। খিদে পেয়েছে। রাস্তার পাশে হইলারে করে নানারকম খাবার বসেওছে। কিন্তু খেতে ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।

আমার হাসি পেল। এক সময় স্ট্রিট ফুডের উপরই বেঁচে থাকতাম। রাজাবাজারের পরোটা, মাংস। চিকেন রোল। নন্দলালের কচুড়ি, মিষ্টি— বা পেতাম গোয়াসে গিলতাম। আর এখন! কোন তেলে ভাজছে। যে রাস্তা করছে তার হাইজিন কেমন! জলটা কি প্যাকেজড। এইসব নানা চিন্তা ঝাপিয়ে পড়ে মাথার ভিতরে।

শিফাগেয় আমি নিজেই রান্না করি বেশির ভাগ দিন। তবে সে রান্না আমি ছাড়া আর কেউ খেতে পারবে না। ল্যাভে যাওয়ার সময়

দুটো কুটি আর একটু তরকারি নিয়ে যাই। বাঁধাকপি, ব্রকোলি যা পাই তাই দিয়ে তরকারি বানিয়ে নিয়ে যাই। বা কোনও-কোনও সিন ওদের ওখানে ক্যান্টিনে বাই। সাত ডলারে মিল দেয় ওখানে। কোনও ডেজিবেল, চিকেন বা টফু দিয়ে স্টারড ফ্রাই আর সঙ্গে একটু রাইস। সবটাই খুব পরিষ্কারভাবে তৈরি।

আমি আবার খাবারের দোকানের দিকে তাকালাম। নীল রং করা একটা হইলার। তার সামনে কয়েকটা ড্যান্সলার দুলছে। তাতে লেখা 'মোমো,' 'ডায়েড রাইস', 'চিলি চিকেন।' আমার অবাক লাগে চাইনিজ রান্নায় চিকেন নিয়ে কত বিভিন্ন রকমের পদ হয়। কিন্তু এখানে রাস্তার পাশের দোকানগুলোয় চিলি চিকেন ছাড়া আর কেউ কিছু বোঝে না।

বিশদেটকে চাপলাম। আমি অনেক পালটে গিয়েছি। এখানে এইসব খাওয়া আর আমার পোষাবে না।

জামার হাতটা স্কুটিয়ে ঘড়ি দেখলাম। দুটো বাজছে। অমায় তো এখানেই দাঁড়াতে বসেছিল। কিন্তু এখনও তো এল না। পেরেকটা যে কী করে!

পেরেক আমার ছোটবেলার বন্ধু। এইচএস অবধি একসঙ্গে পড়েছি আমরা। তারপর আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে অনার্স করে বি টেক—এ ভর্তি হই আর ও আর্টসে চলে যায়। গ্যাজুয়েশনের পর পেরেক আর পড়েনি। একটা স্কেলসেবী সংস্থায় যোগ দিয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছরে কী করেছে সেটা আমি জানি না। জানার ইচ্ছেও নেই। পেরেকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শেষের দিকে পালটে গিয়েছিল একদম। তাছাড়া ওই দেশে গিয়ে এমন একটা মানসিকতায় চলে গিয়েছিলাম যে, কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আর ছিল না। সেই অনিশ্চেষ্টাই এত বছরে অজান্তে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আকাশের দিকে তাকালাম। যত সময় যাচ্ছে তত কালো হয়ে আসছে চারদিক। সঙ্গে বেশ হাওয়াও দিচ্ছে। আমি মোবাইল বের করলাম। গত পরশু যখন পেরেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাথারটা ও নিজেই দিয়েছিল আমায়। নাথার ডায়াল করে কানে লাগালাম মোবাইলটা। চারটে রিঙের পরে ওপাশ থেকে কলটা রিসিভ করল পেরেক।

বললাম, 'কী রে? বললি আসবি। কোথায় তুই?'

পেরেক বলল, 'আসছি, আসছি। অত ছটফট করছিস কেন? আর তোর ভিসার ইন্টারভিউ না কী ব্যাঙ, হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়ে গিয়েছে। তুই আয়। আমার খিদে পেয়েছে। তুই এলে লাঞ্চ করব।'

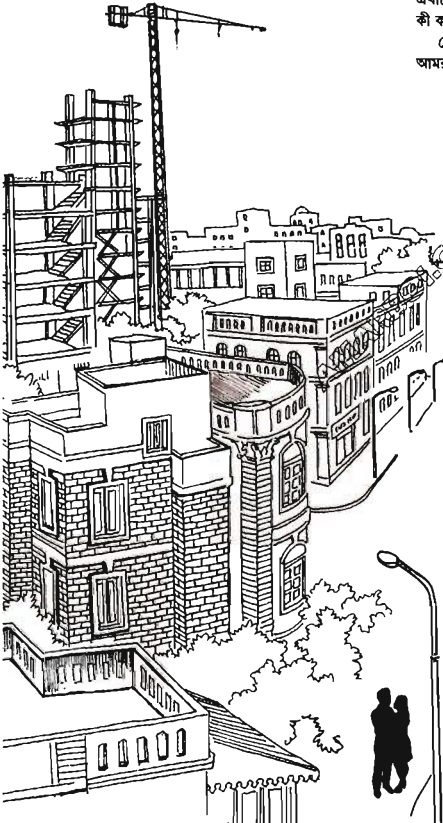
'দশ মিনিট কাকা। বাসে আছি। কী একটা মিছিল বেরিয়েছে। শালা এগোচ্ছেই না বাসটা। রিক্সা, একটু ওয়েট কর ভাই।'

আমি ফোনটা কেটে পকেটে ঢোকাতে গিয়েও পারলাম না। পিং শব্দে একটা মেসেজ ঢুকল। শীতল। ও হঠাৎ মেসেজ করল আমায়।

আমি অবাক হয়ে মেসেজটা দেখলাম। জোকস! পড়ে মোটেও হাসি পেল না। এই অজবাবসি ছেলেমেয়েগুলোকে এই ক'দিনে সেখে বুঝছি ফোনটাকে এরা অক্সিজেন করে নিয়েছে। শীতলও তার ব্যতিক্রম নয়।

শীতল! দশ বছরে কত পালটে গিয়েছে। সেদিন দোকানে ওকে দেখে তো আমি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েরা একটা বয়সের পর কী অদ্ভুতভাবে প্রজাপতি হয়ে ওঠে।

সেদিন আমি শীতলকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম।



তোশানা চোয়াল শক্ত করে দাঁত দেশে বলল, 'কী করোনি? খবরদার আর কোনওদিন আমার ব্যাপারে নাক গলাবে না।'

শীতল বলেছিল, 'তুমি এসেছ? অবশেষে এসে তবে!'
 আমি কী বলব বুঝতে না পেয়ে মাথা নেড়েছিলাম শুধু।
 'বাক্য', কতদিন পর তোমায় দেখলাম। একইরকম তো আছ। কী
 করে বয়সটা ধরে রাখলে রুকুণা?'

আমার কথা আসছিল না। এমন সময় কী বলতে হয়? বাড়ির
 সকলের কুশল জানতে হয়? কিন্তু সেটা জিজ্ঞাস্য করলে যদি ও অন্য
 কিছু ভাবে? আমি কী বলব বুঝতে না পেয়ে শুধু হাসি হাসি মুখে
 তাকিয়েছিলাম শীতলের দিকে।

শীতল আমার হাত ধরে টেনে লোকনের একটা কোনায় নিয়ে
 গিয়েছিল। বলেছিল, 'তা, আছ কেন? তোমার তো খবরই পাওয়া
 যান না! সবাই বলে তুমি নাকি বিদেশে গিয়ে ভুলে গিয়েছ আমাদের।'
 আমি দীর্ঘশ্বাস চেষ্টে হেসেছিলাম আবার। ডেবেছিলাম, এবার
 কিছু বলতেই হবে। না হলে খুব ব্যাপার দেখাচ্ছে। বলেছিলাম, 'ভুলিনি
 রে। আসলে নানা কান্ডে থাকি। ট্রেস থাকে। তাই আর যোগাযোগ
 করা হয়ে ওঠে না।'

'তোমার তো পিএইচ ডি হয়ে গিয়েছে, না?' শীতল বড় বড় চোখ
 করে তাকিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ, তা তো হয়েই গিয়েছে। এখন নর্থ
 ওয়েস্টার্ন-এ আছি।'

শীতল বলেছিল, 'দারুণ ব্যাপার। তা, তুমি এখন ড. রুক্মিণী কুমার
 মুখার্জি?'

'মুখোপাধ্যায়। আর ডক্টরটা গিষি না।'

আমি কথা বুঝে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হাতে কিছুই আসছিল না।

'তুমি বিয়ে করেছ? মানে, দশ বছরে যখন আসনি তখন নিশ্চয়
 ওই দেশে কাউকে বিয়ে করেছ, না?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম শুধু।

'সে কী? কেন? বিয়ে করানি কেন রুকুণা?'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ভুলে গিয়েছি রে। জানিস তো আমার
 কেমন ভুলো মন।'

শীতল কিন্তু আর হাসেনি। বরং কীরকম যেন গম্ভীর হয়ে
 গিয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি তো কিছু জানতে চাইলে না। তোমার কিছু
 জানান নেই?'

আমি মাথা নামিয়ে বলেছিলাম, 'না, কিছু জানতে চাই না।

যতটুকু জানান, জানি।'

'দিগির ব্যাপারটা শুনেছ?'

আমি কিছু না বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম। এটা
 আমি জানি। কিন্তু এটা নিয়ে আমার কী বলার থাকতে পারে।

'কী হল রুকুণা? তোমার কিছু বলার নেই এ ব্যাপারে?'

আমি বলেছিলাম, 'না, নেই শীতল। আই ওয়ক টোশ নট টু বি
 কনসার্নড। আই ওয়ক টোশ টু স্টে আওয়ে। আরায স্টেইং আওয়ে।
 আমি জানি আমার পক্ষিনা।'

শীতল শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'মানুষ জানে না যে, সে
 জানে না।'

'সরি বস, এত লেট হয়ে যাবে ভাবিনি।' পেরেক সামনে এসে
 দশ হাত ভিড কেট নিষ্কে কানটা মুলল।

আমি বললাম, 'সামথিং নেভার চেন্সেস। যেমন তুই, তেমন এই
 শহর!'

'পেরের কথা বলিস না, পেরেক উত্তেজিত হল, 'কোন সাহেবের
 ও মাড়িয়েছিস? শালা, মনে আছে তুই ঠেকে লেট করে আসতিস।'
 আমি কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'চল, কিছু খেয়ে নিই। খুব
 খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমরাও।' পেরেক দু'হাত ঘষে বলল, 'কী খাবি বল?
 বিরিয়ানি? সামনেই একটা লোক বসে হাঁড়ি নিয়ে। ব্যাপক।'

'বসে মানে?' আমি ভুরু কৌচকলাম।

'আঃ, চল না দেখবি।'

পেরেক আমার কথা বলতে না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে
 সামনে নিয়ে গেল।

শেখিন্ধ হাটতে হল না। সামনে রাস্তাটা যেখানে বাঁদিকে বঁকে
 যাচ্ছে, সেখানেই দেখলাম লোকটাকে। রোমে পোড়া তামাতে রং।
 মোটা। কুল কুল করে ঘামছে। ডান হাতে একটা তামার বালা।

লোকটার সামনে একটা টেবিল। তার ওপর ঢাকনা দেওয়া একটা
 বড় হাঁড়ি। তাতে লাগ লাগ লাগানো। টেবিল থেকে একটা লিস্ট
 মুলছে। লেখা, চিকেন বিরিয়ানি আশি টাকা আর মটিন বিরিয়ানি
 নব্বই টাকা স্ট্রে।

পেরেক বলল, 'চল, এখানে খাব। ওঃ, লোকটা যা বানায় না!
 গন্ধ পেটের ভেতর ভাইনোসর লাফাচ্ছে।'

আমি চোখাল শব্দ করলাম। এখানে খাব। লোকটা প্রচণ্ড ঘামছে।
 কাঁধে যে চেককাটা ভোয়ালোটা দিয়ে বাম মুছে, আবার সেটা দিয়ে
 ধরেই হাড়ির ঢাকনা খুলছে। লোকটার চারদিকে বেশ ভিড়। চারটে
 প্লাস্টিকের টুলে বসে থাকা মানুষ ছাড়াও আরও দশজন দাঁড়িয়ে
 রয়েছে সামনে। আর এটা প্লেটগুলো একটা বাচ্চা ছেলে পাশে রাখা
 জলের পাড়ে ডুবিয়ে কোনওরকমে দুটো ডগা দিয়েই উঠিয়ে নিচ্ছে।

তাহাড়ি বিরিয়ানিও দেখলাম। তেলে মা ঘেঁষিয়ে রাধা কা
 বোঝা যাচ্ছে না। কাটা পেঁয়াজ আর শশা খাবলা মেয়ে হাত দিয়ে
 তুলে ওই যেমো লোকটাই ছড়িয়ে দিচ্ছে বিরিয়ানির ওপর।

'কী রে মালটা। ফুটপাথের সঙ্গে আটকে গেলি যে! আয়।'

পেরেক হাত ধরে টানল আমায়।

আমি চট করে ছাড়িয়ে নিলাম হাতটা, 'না, আমি এখানে খাব না।
 পারব না।'

'মনেই পেরেকের অবাধ হয়ে তাকাল আমার দিকে, 'মনে নেই,
 তুই গিন্নি আমি ডালহৌসিতে এমন ভ্রাতা বিরিয়ানি কত স্ট্রে
 উঠিয়েছি।'

'সে তো আগে অনেক কিছুই করেছে। তা বলে এখনও করতে
 হবে? আমার বিরক্ত লাগল, 'জানিস না এগুলো বিষ।'

'আমরা তো শালা নিজেরাই বিষ! আয় না।'

'না পেরেক, ' আমি বললাম, 'সামনে চলে। আসার সময় একটা
 বড় রেস্টুরেন্ট দেখেছি। সেখানে চল। ওরাও যোগলাই ডিশ করে।'

পেরেক আহত হয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল, 'শালা।

ডিগবান্ধি। এতটা পালটে গিয়েছিল। ক দিন ওখানে থেকে খুব হেলথ
 কনসাস হয়েছিল, না? আর কী কী হয়েছিল শুনি।'

'হেলথ কনসাস? আমি তাকালাম পেরেকের দিকে, 'শোন,
 আমার শরীর নিয়ে আমাকেই তো ভাবতে হবে। আর শুধু হেলথ,
 না? এখানে লোকের সমস্যাটা কী জানিস? এখানে সবাই আজকাল
 হেলথ নিয়ে চিন্তা করে, কিন্তু খুব কম মানুষ আছে যাঁরা হাইজিন নিয়ে
 ভাবে। দাঁতে প্লাক, পোকা, লবার সামনে নাচে আঙুল দেয়, ঘাউ ঘাউ
 করে ঢেকুর তোলে, সিগারেট-বিড়ি খেয়ে অন্যের মুখের ওপর ধোঁয়া
 ছাড়ে, যেখানে-সেখানে পুতু ফেলে, বাথরুম করে! এসব নিয়ে কেউ
 ভাবে না কেন বল তো! লেকে গিয়ে সকালে দৌড়লেই সব হেলথ
 তৈরি হয়ে যাবে, না? অসভ্যতা করা আর গণভাতিক অবিকার
 ব্যাপারটা বেঁটে, গুলিয়ে গেলে যা হয় এখানে সকলের তাই হয়েছে।'

পেরেক বলল, 'খুব পালটে গিয়েছিল তুই।'

'তো কী এক্সপেক্ট করেছিলি? দশ বছর আগের সেই ব্রঙ্কড অ্যান্ড
 ব্যাটারড হেলোটাই থাকবে? শোন, এই পৃথিবীতে মানুষের চেঞ্জ ইক্স দা
 ওনলি কনস্ট্যান্ট। আমাদের চেঞ্জ হয়, গ্রোথ হয়। এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড
 সরো ওয়ার্ড আভজ আ ক্যাটালিস্ট। আমি মানুষ পেরেক, বনমানুষ নই
 যে পালটানো না।'

পেরেক আমার দিকে তাকিয়ে থাকল থ হয়ে। তারপর আচমকা
 বলল, 'ওঃ দারুণ। আমি বড় হয়ে তোর মতো হব! তুই তো দশ
 বছরে পুরো বোকা থেকে বাঁধী হয়ে গিয়েছিস।'

আমি কী বলব বুঝতে না পেয়ে এবার হেসে ফেললাম।

পেরেক বলল, 'শোন ভাই, তুই যে রেশুরা সেখান্ধিস ওখানে তোকে খাওয়াবার পয়সা আমার নেই। এখানে দু'স্ট্রেট দুশোয় হয়ে যেত। ওখানে একটা স্ট্রেটও দুশোয় হবে কি না সম্ভবই।'

আমি বললাম, 'তোকে আমি বলেছি দাম দিতে? বাঁচার দিয়ে যাওয়া সেই চপ আর ওমলেটগুলো যখন যেতাম, তুই-ই কিছু দাম দিতিস। আমি সেই নিয়ে ফাস করিনি কখনও! আজ আমিই দাম দেব। তুই এ নিয়ে কিছু বলবি না। চম।'

রেশুরায় ঢুক আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভিতরটা এয়ার কন্ডিশনড। বাইরের প্যাচপ্যাচে গরমের থেকে ওয়েলকাম ব্রেক একটা।

বিরিয়ানি আর চাপের অর্ডার দিয়ে আমি শুড়িয়ে বসলাম। জিল্লেন করলাম, 'তোর কী বলার আছে বল এবার। পাড়ায় বলা যেত না?'

পেরেক সামনে রাখা জলটা খেল একটু। তারপর একটা পেপার টাওয়েল নিয়ে মুখটা মুছে বলল, 'যেত না। কারণ, আমি বাড়িতে ফিরি অনেক রাতে। সারাদিন টাইটই করতে হয়। একটা সাইট থেকে আর-একটা সাইটে মাকুর মতো পৌঁড়ই। তাছাড়া...'

আমি অবাক হলাম, 'তোর সেই বেক্হাসেসবী সযে কি তোর ওপর অনেক দায়িত্ব? আর কী তাছাড়া?'

পেরেক বলল, 'ওসব সংঘ-ফংঘ আর নেই। বাড়িতে ইড়ি চড়বে সংঘ করতে গেলে? আমি এখন নীরঞ্জদার হয়ে কাজ করি।'

'নীরঞ্জদা? সে কে?'

'আরে, নীরঞ্জ সারদেশাই। বড়রাতার পাশে ওর বিশাল দোকানটা দেখিসনি? নীরঞ্জদা খুব বড় বিজ্ঞেনসম্যান। অনেক কিছু ব্যবসা আছে। বছর চারেক হল প্রোমোটিংয়েও নেমেছে। পাড়ার রতন সাউ আর পুলকজদের বাড়ি ভেঙে স্ট্রাটটা তো নীরঞ্জদাই করছে।'

আমি তাকিয়ে রইলাম পেরেকের দিকে। সেমিন পাড়ায় আমার মোবাইল নাখারটা নিয়ে খুব ব্রলট চলে গিয়েছিল। গ্যে ফোন করে আজ এখানে দেখা করার কথা বলেছিল। কিন্তু কেন সেটা এখনও বুঝতে পারছি না।

পেরেক বলল, 'তুই তো সেই যে গেলি আর এলি না। যোগাযোগও করলি না। কত কী যে ঘটে গেল এর মধ্যে। সেখান্ধিস তো?'

আমি কিছু না বলে কাঁটা আর চামচ নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। সব কিছুর সবসময় উত্তর হয় না। আর পেরেক যা বলছে তা উত্তর পাওয়ায় জ্ঞানও নয়।

ও বলল, 'তুই কি আগের সব কিছু মনে রেখেছিস?'

আমি বললাম, 'তুই এসব ছাড়। কী বলবি সেটা বলা।'

পেরেক ঠোট টিপে তাকাল আমার দিকে। তারপর বলল, 'তুই কি আর এখানে ফিরবি? মানে, এই দেশে ফিরবি?'

আমি সময় নিলাম একটু। তারপর বললাম, 'ইচ্ছে তো নেই। আসলে ওখানেই ফিট করে গিয়েছি। প্রথম প্রথম খুব অসুবিধে হত। কিন্তু এখন ভাল লাগে। আমি একটু একা থাকতে ভালবাসি। আশ্যে যে রেসপন্সি প্রাইভেসি।'

পেরেক আরও কিছু বলতে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগেই খাবার চলে এল।

বিরিয়ানি থেকে ধোঁয়া উঠছে। গন্ধটাও ভাল। শুধু চাপটা দেখে চাপ বেয়ে গেলাম। কী ভেলে রে বাবা! বৃশ জ্ঞানতে পারলে বোমা মারবে।

'শোন,' পেরেক খাবারের দিকে না তাকিয়ে ঝুঁকে এল সামনে, 'তবে তো ব্যাপারটা ইঞ্জি হয়ে গেল। কাকু, মানে তোরা বাবা কি... মানে, এই যে তোদের বাড়ি সেটার তোরা বাবার কি কোনও ভাগ আছে?'

'মানে? আমি বিস্কট হলাম, 'সে জেনে তুই কী করবি?'

'তোরা কাকু এসেছিল নীরঞ্জদার কাছে। কাকু চায় বাড়িটা

নীরঞ্জদাকে বিক্রি করে দিতে। কিন্তু বাড়িটা তিন পার্টে ভাগ করা।

তোরা কাকু, কাকুমা আর খাটটা তোরা বাবার। তাই না?'

'না, খাট পার্টটা আমার নামে।'

'তাই! তবে তো দারুণ।' পেরেক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, 'সেটা আমাদের চাই তবে। মানে বাড়িটা তুই ইয়ে, তোরা তবে আমাদের বিক্রি করে দে। টাকা পাবি, স্ট্রাট পাবি। সবই পাবি। ভাল হবে।'

আমি উত্তর না দিয়ে যেতে শুরু করলাম। বিরিয়ানি আমার খুব পছন্দের খাবার। ওখানে ডেভল স্ট্রিটে মাঝে মাঝে বিরিয়ানি খেতে যাই আমি। 'সাত্রি নিহারি'-র বিরিয়ানি ওখানে বিখ্যাত।

পেরেক স্ট্রেটটা টেনে নিয়ে বলল, 'কীরে, কী বললাম, শুনলি না?'

আমি তাকালাম ওর দিকে। বললাম, 'তোদের সেই নাইট স্কুলটা আছে এখনও? সেই যে ব্যাকানের ইন্সপেকশনডল ডে-তে মুখোশ, বেলুন আর ঢিকি দিতিস, সেগুলোও তো সব বন্ধ হয়ে গেছে, না? আর বছরে একবার শুন্ড এজ হোমে গিয়ে যে বৃদ্ধ ব্যাকানের-ঘুরতে নিয়ে যেতিস, সেটা?'

পেরেক খেতে খেতে থমকাল এবার। তারপর বলল, 'দশ বছর অনেক সময় রে রকু। আর আমিও বনমানুষ নই!'

এরপর খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত বিরিয়ানির গন্ধ আর বাষ্প ভারী হয়ে খুলে রইল আমাদের মধ্যে। আমরা দু'জনেই কেউ বিশেষ কথা বললাম না। আসলে খুব কিছু বলার যে নেই, তা বেশ বুঝতে পারছি আমি।

খাওয়া শেষ করে বিল মিটিয়ে বাইরে এসে পেরেক আর দাঁড়াল না। বলল, 'মার্শে দুটো সাইট চলছে। যেতে হবে রে। তবে যা বললাম মাথায় রাখিস। তুই তো চলোঁই যাবি। থোক টাকা নিয়ে যা। কাকু বলছিল, 'তোরা নাকি এখন টাকার দরকার।'

পেরেকের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। আপনা থেকেই একটা গীর্ঘ্বাস পড়ল আমার। বন্ধু 'বন্ধুর' হয়ে গিয়েছে।

একটা ট্যান্সি ধরলাম। কলকাতায় এই ট্যান্সিগুলো নতুন। সাধারণ ওপর নীল ট্রাইপ দেখায়। গায়ে লেখা 'নো রিফিউজাল'। ভেতরে আবার এলি আছে। জিপিএস-ও।

ট্যান্সিতে উঠে কোথায় যাব বলতে-বলতেই ভেঙে বৃষ্টি এল। এতক্ষণ যে সান্নিধ্যগোছ করেছিল সেটা নিয়ে যেন মজ্ঞে কাঁপিয়ে পড়ল কোনও অভিনেতা।

আমি জ্ঞানলার ডেজা কাচ দিয়ে কলকাতা দেখতে লাগলাম। অসময়ের বৃষ্টিতে অপ্রস্তুত কলকাতা। শেষ দুপুরে হতোয়াম কলকাতা। আমার এক সময়ের কষ্টের কলকাতা।

আচমকা পেরেকের শেষ কথাটা মনে পড়ল। 'কাকু বলছিল, 'তোরা নাকি এখন টাকার দরকার।'

কাকু এটা বলেছে ওকে! সত্যি!

আসলে কাকুকে এমনি কথায় কথায় বলেছিলাম যে, সামনে আমায় গ্রিন কার্ডের জন্য মুত করতে হবে। ভাল লইয়ার না ধরলে কার্ড হওয়া মুশকিল। আর ওই দেশে লইয়াররা খুব কন্টলি হয়। সব মিলিয়ে সাত আট হাজার ডলারও লাগতে পারো। কিন্তু তা-ও যে গ্রিন কার্ড পাব তার নিশ্চয়তা নেই। ফলে ব্যাপারটা বেশ চাপের। আমি তাই নিয়ে ভিতরে ভিতরে টেনশনে আছি।

কিন্তু সেই কথাটা কাকু কেন বলতে গেল পেরেককে? আর কাকুই বা বাড়িটা বিক্রি করতে চায় কেন? ওয়ের বিয়ের টাকার দরকার? বাড়িটা রাসবিহারী ছাড়াতেই যেন বৃষ্টিটা আরও জাঁকিয়ে নামল।

সবুজ ছাড়া নেই। জানি, বাড়ির সামনে না গেলে ডিজে যাব একেবারে।

ছেট সেই শর্ট কাটের গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। তাই বড়রাতা দিয়ে ঘুরিয়ে গাড়িটা পাড়ায় ঢোকালাম। জ্বাইভার একটু গাইগুই করছিল কিন্তু আমি পাশা বিলাম না।

গাড়ির সামনে একটা রিকশা চলছে। তাই শপিড তুলতে পারছে না।

ড্রাইভারটা বলল, 'সাব ইয়াহা পে ছোড় দিঙ্কিয়ে না।'

'কিউ? ভিগাওগে কোয়া মুখে?' আমি বললাম, 'বুঝার হো গয়া তো!'

'পর সাব, এক পাসিঞ্জার হায়। মিল্ল সাব,' ড্রাইভারটি গহিওঁই করল।

প্যাসেঞ্জার! অবাক হলাম। বললাম, 'ঠিক হায়। রোকা কির। কিতনা হয়া?'

আমি টাকা মিটিয়ে তাকালাম বাইরে। অক্সোর বৃষ্টিতে জ্ঞানলার কাচ আবছা। তবে তা দিয়ে খুব অস্পষ্টভাবে একটা ছাতা মাথায় দেওয়া অবয়ব দেখা যাচ্ছে।

আমি ভাবলাম এখান থেকে আমার বাড়ি দৌড়ে গেলে তিরিশ সেকেন্ড। হাতের দরকারি কাগজের ফাইলটা ভাগিস প্রান্টেকের!

আমি দরজাটা খুলে প্রস্তুত হলাম। এক ছুট্টে বাড়িতে ঢুকে যেতে হবে। না হলেই বিপদ।

আকাশটা দেখে নিয়ে আমি লাকিয়ে নামলাম রাস্তায়। কিন্তু নেমেও দৌড়তে পারলাম না। জমে গেলাম নিমেঘের মধ্যে। মনে হল আচমকা অস্বাভাবিক কমে গেছে হাওয়ায়। জলের ভিতর কে কেন ষড়যন্ত্র করে ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাঙের ঠাণ্ডা রক্ত। কে যেন সকলের অলসকে বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ।

আমি দেখলাম, আমার এক হাতের দূরত্বে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে তোশানা।

II গ II

আমি তাকিয়ে রইলাম। তোশানার চোখ দুটো সরছে না আমার চোখ থেকে। যেন কেউ পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। হাতের তালুতে ঘাম। মনে হল কেউ যেন অজ্ঞত কাচের গুলি গড়িয়ে দিয়েছে পেটের মধ্যে।

আমি জিত দিয়ে চৌঁট চাটলাম। ঢোক গিললাম। তারপর নামিয়ে নিলাম চোখ। কারও কারও দৃষ্টিতে তেজস্ক্রিয়তা থাকে। সুস্থ করা যায় না!

আমি ধাতস্ত হতে সময় নিলাম একটু। তারপর আবার মুখ তুললাম। দেখলাম আর্থ এগিয়ে আসছে এবার। হাতে ধরা হলুদ রঙের একটা গোলাপ!

আর্থ বলল, 'অ্যাট লাস্ট অয়াম হিয়ার।'

তোশানা এবার আমার দিক থেকে চোব সরিয়ে তাকাল আর্থর দিকে।

আর্থ আরও দু'পা এগিয়ে গেল। তারপর হাটু গেড়ে বসে বলল:

'Somewhere i have never travelled, gladly beyond
any experience, your eyes have their silence:
in your most frail gesture are things which enclose me,
or which i cannot touch because they are too near

Your slightest look easily will unclose me
though i have closed myself as fingers,
You open always petal by petal myself as Spring opens
(touching skilfully, mysteriously) her first rose

or if your wish be to close me, i and
my life will shut very beautifully, suddenly,
as when the heart of this flower imagines
the snow carefully everywhere descending;

'শালা, কী বলছিস তুই?'

আমার পাশ থেকে ছিটকে উঠল পেরেক।

আশপাশের সকলে পেরেকের এই আচমকা চিৎকারে চমকে উঠল। আমিও ঘাবড়ে গেলাম। কী করছে কী ছেলোটা!

পেরেক বলল, 'এই আর্থ, এটা কী ঢাপের নাটক লিখেছিস তুই? অর্ধেক ডায়ালগ ইংরেজিতে। আর এটা কী বললি? এক লাইনও তো বুঝতে পারলাম না!'

আর্থ লাইব্রেরির স্টেজের সামনে থেকে লাফ মেরে নেমে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। তারপর বলল, 'তোরা আই কিউ-তে আসবে না। মানে, সবুজের জল তো আর মগে ধরে না।'

পেরেক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'গত তিন সপ্তাহ ধরে এই তোদের নাটকের রিহার্সাল চলছে। তোরা মতো গেঁড়ে-পাকাকে নাটক লিখতে বলাই ভুল হয়েছে। শালা, প্রেমের দৃশ্যে এসব কী আটু-বাটু বকছিস তুই? আমি এদিকটা দেখিনি আর তাতেই খোল করলি।'

'ই ই কামিল-এর লেখা আটু-বাটু? অশিক্ষিতের মতো কথা বলিস না! আর্থ পা দাপাল, 'তুই কী বুকিস রে মর্কট? নাটক দেখছিস কোনদিন!'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। হয়ে গেল আজকের রিহার্সাল! আমাদের কলেজ তিন দিন বন্ধ আছে। বাড়িতে এমনভেই একটা মনখারাপের হাওয়া পাক মারে সব সময়। তা থেকে ঋনিকটা রেহাই পেতেই অল্প কয়েকটা বেরিয়েছিলাম। ডেবেছিলাম, একা একা একটু হাটবা। কিন্তু পেরেক ধরেছিল পাড়ার মোড়ে। বলেছিল, 'কী রে, আজ কলেজ বাসিনি। নাকি ডুব দিয়েছিস।'

বলেছিলাম, 'কলেজ ছুটি।'

তোর নাকি। দারুণ ব্যাপার তো! বেশ তবে চল আমার সঙ্গে। হাউজেরদিকে যা। তোশানাদের রিহার্সালটা একবার নিজের গোবেই দেখে আসি। আর্থ তো বড় মুখ করে বলেছে, ফাটিয়ে নাকি একটা নাটক লিখেছে। চল, দেখে আসি সেটা কতটা খুলিয়েছে।

ওর কথা শুনে এখানে এসে কী যে বিপদে পড়লাম!

পেরেক বলল, 'এটা নাটক হচ্ছে? এটা তোরা ইংরেজির জ্ঞান ফলানোর জায়গা? আর তোশানা কী করছে এটা! স্টেজে মন না দিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছে কেন? শালা, এই তুই ডায়রেক্টর!'

আর্থ চশমা খুলে পাঞ্জাবির হাতায় মুখটা মুছল। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলল, 'তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। এটা একটা লাভ স্টোরি! উইথ অ ডিপ আন্ডার কারেন্ট অফ সুরিয়ালিজম।'

'মারব পাছায় লাথ।' পেরেক দাঁত কিড়মিড় করল, 'পাড়ার মা, কাকিমা, মিসিমা, কাকু, দাদুমা দেখবে, আর সেখানে সুরিয়ালিজম।

ড্যামনামো করার জায়গা পাসনি! তোকে করতে হবে না নাটক। সুকুমার রায়ের লেখা থেকে একটা নাটক নামাতে বলাই উচিত ছিল আমার। তোদের মতো পিছন পাকাতুলোকে নিয়ে মুশকিল কী

জানিস? তোরা ভাবিস কঠিন কিছু কথা এলোমেলোভাবে বললেই খুব ডিপ থট হয়ে গেল!'

আমার এসব ভাল লাগে না। আমার কপালটাই কি এমন?

যেখানে যাব সেখানেই শুধু অনের ঝগড়ার মধ্যে পড়ব। যে কারণে বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে না সেটা কি এখানেও তাদা করবে

আমায়।

মা গত তিন-চারদিন ঠিক আছে। আসলে বাড়িতে বাবা নেই।

অফিসের কাজে মধ্যপ্রদেশ গিয়েছে।

লোকে শুনেছে খারাপ ভাবে, কিন্তু সত্যি বলতে কী বাড়িতে বাবা না থাকলেই যেন বাড়িতে শান্তি থাকে। আসলে বাবা থাকলে বাবা

নিজে কিছু করে না। কিছু মাঝের কোনও কথার জবাবও দেয় না।

তখন মা ঠিক কিছু না কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে আমেলা শুরু করে দেয়। আর সেটা এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যে, আশপাশের

বাড়ির জানালায় বিনা টিকিটের দর্শকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে! কে বলে শহরে মানুষ যার যার তার মতো করে থাকে! হ্যাঁ, কাউকে সাহায্য করার ব্যাপারে হয়তো একটা নিশ্চলতা দেখায়, কিন্তু অনের সংসারের টক গন্ধ পেলেই আর তাদের উৎসাহের সীমা থাকে না! আমাদের শহরে মানুষদের এই সিলেগিড ইনভলভমেন্টকে আমার স্খন্দ্য লাগে! গত দিনও যখন বাবাকে মেয়ে রা মস্ত বের করে দিয়েছিল, আগশাপের বাড়ির গ্যালারি ভর্তি হয়ে উঠেছিল দর্শকে। বাবার তেমন স্তরভর কিছু হয়নি। কিন্তু তার পরের দু'দিন পাড়ার সোমস্কান বহবার আমায় রাত্তায় দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল বাবার অবস্থা! কতটা আশ্চর্যজনক!

আমি লাইব্রেরির বাইরে এসে দাঁড়িলাম। শরৎকাল এমনিতে ভাল হলেও মাঝে-মাঝে একটা দম চাপা ভাব আসে হাওয়ায়। আজ যেমন আছে।

আমি মোবাইলটা বের করে দেখলাম। আরে। চার্জ চলে গেছে। কখন গেল। আমার বিরক্ত লাগল। মোবাইল ছাড়া মনে হয় হারিয়ে গিয়েছি।

‘কী! প্রেমিকা ফোন করেছে?’

আচমকা পাশ থেকে গলা পেয়ে আমি একটু চমকে গেলাম। তোশানা! বিড়াল নাকি। কখন এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারিনি।

আমি মোবাইলটা পকেটে রেখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

তোশানা বলল, ‘কী হল উত্তর মিলে না? প্রেমিকা?’

আমি বললাম, ‘নাঃ, তেমন কিছু নয়। মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’

তোশানা হাসল, ‘আচ্ছা, তোমার সম্বন্ধে তো আমি সবর নিয়েছি কিছুটা। কিন্তু তুমি কি আমার সম্বন্ধে কিছু জেনেছ?’

আমি তাকালাম তোশানার দিকে। বিকেলের নরম আলো ওর মুখে লেগে কেমন যেন রং পালটে নিচ্ছে নিজের। চুয়িংগামের আবহা একটা গন্ধ আসছে ওর দিক থেকে। ওর জ্বলজ্বালপের কুর্ভার মধ্যে যেন গোটা একটা বনভূমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মনে হচ্ছে ঘন সবুজের এক জঙ্গল আমায় ডাকছে।

আমার মতো মানুষের সামনে এসব কেন আনে ভগবান! যা আমার নয়, হবেও না কোনওদিন, সেসব কিছু কেন সামনে ধরে আমায়। আমি গীর্ধ্বাস লুকিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম ছাই রঙের ঘবা কাচ মাথার উপর। বোঝা যাচ্ছে না ভগবান তার ওই পারে আছে না স্বর্গের ব্যালকনি শূন্য।

‘কী হল? আমার সম্বন্ধে কিছু সবর নিয়েছ?’

‘কী হবে নিয়ে?’ আমি নিচু গলায় বললাম।

তোশানা কুর্ভার নিচে পরা জিনিসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চুয়িংগামের স্ট্রিপ বের করে, তা থেকে দুটো আয়তাকার চুয়িংগাম আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, ‘সব সময় এমন ম্যামা মারা ভাব কেন তোমার? এই বরষে এন্ডটা ডিপ্রেসড কেন? চোখ সেখলেই মনে হয় যেন টানা এগারোটা ম্যাচ হেরেছ।’

আমি চুয়িংগামটা নিয়ে মুখে পুরে ওর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম।

‘ধাক,’ তোশানা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘কাঠের পুতুলের মতো মুখ করতে হবে না। হাসছে না যেন কুইনাইন খাচ্ছে। শোনা, আমি এম এ করছি। ইতিহাসে।’ সস্পে গান করি।

আমি বললাম, ‘ও!’

‘পি কিউ আর এস টি বললে না?’ তোশানা ভুরু কুঁচকে তাকাল আমায় দিকে।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। আরে বাবা, মেয়েটা এমন করছে কেন।

সবো দু’-তিনবার দেখা হয়েছে। কিন্তু এমন করছে যেন কুড়ি বছর ধরে চলে। কেসটা কী রে ভাই!

তোশানা বলল, ‘তোমার খুব ঘাম, না? আমি যেতে এসব বলছি বলে কি হ্যাংলা ভাবছ নাকি? আমায় রাগিয়ে দিয়ে না কিন্তু। রেগে

গেলে আমি খুব সাংঘাতিক হয়ে যাই। বুকেছ?’

আমি মাথা নাড়লাম। এমনভাবে শোনাতে যে কেউ বুকে যাবে!

‘ছাই বুকেছ! সায়েলগের, হলেদের তাইনার সিলিংস থাকে না।

থাকলে... এর জন্য পোয়েট্রি পাড়তে হয়। জান সেটা কী? আর্থ রিহাসলো কী বলছিল জান? জানলে এত বোঝাতে হত না আমায়।’ তোশানা বিরক্ত হয়ে চুলের ভিতর আঙুল ডুবিয়ে সিঁথি ঠিক করল।

আমি তাকিয়ে রইলাম ওর হাতের দিকে। দম বন্ধ করা সুন্দর দুটো হাত। নেলপলিশের বিজ্ঞাপন যেন।

‘কী?’ তোশানা চোখ দুটো আবার পেরেক দিয়ে গেঁথে নিল

আমার চোখের সঙ্গে।

আমি শুধু বললাম:

‘Nothing which we are to perceive in this world equals the power of your intense fragility: whose texture compels me with the color of its countries, rendering death and forever with each breathing

(i do not know what it is about you that closes and opens; only something in me understands the voice of your eyes is deeper than all roses) nobody, not even the rain, has such small hands’

তোশানা ধমকে গেল এবার। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

আমি হাসলাম, ‘ই ই কমিল। সত্যি, বৃষ্টির চেয়েও ছোট হাত

তোমার।’

তোশানির মুখটা নিম্নেয়ে লাল হয়ে গেল। ও মাথা নামিয়ে নিল ধীরে।

আরে, তোরা এখনো কী করছিস?’

আমি শিকন থেকে পেরেকের গলা পেলাম। দেখলাম, ও আর আর্থ লাইব্রেরির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মনটা তেতো হয়ে গেল। একটা মুহূর্ত তৈরি হচ্ছিল। ভেঙে গেল।

তোশানা চুট করে ঘুরল, বলল, ‘তোরা যা শুরু করছিস ভিতরে, কে থাকবে ওখানে? বরং স্টেজে তোরা এটাই করিস। দুই বন্ধু মিলে ঝগড়া করিস। দেখবি, লোকে খুব মজা পাবে। অন্যর ঝগড়া দেখার মতো আশ্চর্য মজা খুব কম আছে, তাই না?’

পেরেক দিয়ে এসে বলল, ‘তুই ব্যাপারটা বুঝলি না। আরে, আমায় তো গেটটাটা সেবতে হয়, নাকি? পাড়ার সাধারণ মানুষ কি এসব ইংরেজি বুঝবে, বল? পণ্ডিতি দেখালেই হল। একটা স্থান-কাল-পাত্র থাকবে না!’

তোশানা বলল, ‘সাধারণ মানুষ। ইয়াক। এইসব খবরের কাগজের ভাষা শুনে বিরক্তি লাগে আমার। আমি ভিতরে যাই। তোরা এখানেও নারস নারস কর।’

কিন্তু তোশানা ভিতরে যেতে পারল না। কারণ, একটা গাড়ি। একটা নীল রঙের ছোট গাড়ি তিক তখনই এসে কাঁচ করে থামল আমাদের লাইব্রেরির সামনে। আর তার জানালা দিয়ে মুখ বের করল জিনিভা।

‘হাই স্কুল! হোয়াটস আপ ম্যান। তোর মোবাইল বন্ধ কেন রে? আথ ঘণ্টা ধরে উই করছি।’

আমি আড়চোখে আর্থর মুখটা দেখলাম। আর্থ সব ভুলে ফ্যালফ্যাল করে জিনিভাকে দেখে।

জিনিভা গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল। বলল, ‘এটা নতুন কিনল বাবা। এক্সক্লুসিভলি আমার জন্য। ভাল না? আগে বাবার অন্য গাড়িতে যেতে হত। এবার থেকে এটা করেই আমরা যাব, কেমন?’

দেখলাম, তোশানা আমার পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে মাপল জিনিভাকে! মেয়েদের চোখটা মাল্টিপারপাস। তার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা

যেমন থাকে, আবার তাতে মেকারিং টেপও থাকে।

জিনিভাও এবার লক্ষ করল তোশানাকে। সামান্য সময়ের জন্য ওর মুখটা শক্ত হল কি! ও এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি জিনিভা! কুকুর সঙ্গে বি টেক করছি। তুমি?'

'তোশানা মির্র।'

'এই পাশায় থাকো? আগে দেখিনি তো! নতুন এসেছ?'

'হ্যাঁ, তোশানা ছোট্ট করে বলল।

'কোনটা হ্যাঁ?' জিনিভা হাসল।

'দুটোই।'

'কী পড়ছ?' জিনিভাও কি টেপ-ফিতে বের করল নাকি!

'মাস্টার্স।'

'বাঃ, কোন সাবজেক্ট?'

'হিস্ট্রি।' তোশানা পাখর মুখে এককথায় উত্তর চাপু রাখল।

'অ! জিনিভা যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলল হঠাৎ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মানডে আমার সবেই বাবি কিঙ্ক। টালিগঞ্জ থানার সামনে থেকে সাড়ে নটায়ে ভুলে নেব তোকে।'

আমি বললাম, 'এটা বলতে নিশ্চয় আসিনি।'

জিনিভা হাসল। ঝকঝকে দাঁতগুলো বলমল করে উঠল শেষ বিকেলের আভায়ে। বলল, 'আরে, মা পাগলো আর মাসে করেছে আঙ্ক আমার ছুটি বলে। তাই তোকে দিয়ে গেলাম। আসার আগে তোকে কোন করেছিলাম। কিন্তু তোকে ফোনে না পেয়ে সোজা তোদের বাড়িতেই কাকিমাকে দিয়ে এসেছি। সঙ্গে পায়েরসও আছে।' কথাটা শেষ করে তোশানার দিকে তাকাল জিনিভা। কিছু বলল কি নিঃশব্দে?

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

জিনিভা হেসে বলল, 'কাকিমাই বলল যে, তুই হয়তো এখানে এসেছিস। তাই দেখা করে গেলাম। যাক গে, আমি আঙ্ক আসি। এখন আবার ক্লাবে যেতে হবে। বাবি কিঙ্ক। পায়েরসটা আমি নিজে বানিয়েছি। বাই।'

গাড়িতে উঠে জিনিভা আর-একবার হাত নাড়ল আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর চলে গেল।

আর্য বলল, 'ওঃ, দারুণ মেয়ে। তাই না রে তোশানা। তোশানা আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ও, ঝুই জন্য মোবাইল বন্ধ বলে হা-হতাশ হচ্ছিল।'

আমি অবাক হলাম, 'হা-হতাশ। পাগল নাকি?'

'সে তো দেখলামই।' তোশানা লাইব্রেরির ভিতরে যাবে বলে ঘুরল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা ঠিকই বলেছে তোমার সম্বন্ধে। ছেলোটা ভাল না। পড়াশোনায় ভাল হলেই তো সব হয় না। সতি, বড়রা যা বলে ঠিকই বলে।'

'মানে?' আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তোশানার দিকে। তোশানা আর ভাবসম্ভারণ করতে দাঁড়াল না। ঝগলা কামিজটা ঘুরিয়ে অশুশ হয়ে গেল লাইব্রেরির ভিতর।

আরও গেল পিছন-পিছন।

পেরেক গোটা ব্যাপারটা দেখছিল ভুরু কুঁচকে। এইবার এগিয়ে এসে গালের দাড়িতে হাত ঘষে বলল, 'অত মানে জেনে কী হবে তোয়? আর জিনিভার সঙ্গে তোয় কেসটা এত দূর গড়িয়েছে জানাসনি তো।'

'আরে! আমার বিরক্ত লাগল এবার, 'ফালতু কথা বলিস না।'

পেরেক হেসে বলল, 'ফালতু কথা মানে। তোদের দু'জনকে দারুণ মানিয়েছে। লজ্জা কিসের? চালিয়ে যাও গুরু। বড়লোকের মেয়ে। বড় গাছ। বাঁধো নৌকা! বেস্ট অব লাক।'

'পাগল নাকি তুই? এসব একদম বলবি না।' আমার মাথা গরম হয়ে গেল। পেরেক যদি এসব নিয়ে ডুলডাল কথা রটায়, তবে! যদি তোশানার কানে যায়, তবে!

'পাগল নই। যা দেখছি বলছি। ভালই তো। তোর কীবনে এমন

একটা মেয়ে দরকার! জানিস তো আমাদের মন গোলাপের মতো। টোভার। এর ভাল যত্ন দরকার। জিনিভা তোর গোলাপটার যত্ন নিতে পারবে। বুঝলি!'

আমি বিরক্ত হয়ে তাকলাম পেরেকের দিকে। সবার মুখে কবিত্ব মানায় না। পেরেকের মুখেও মানাচ্ছে না। আমি বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আমার আর জিনিভার প্রেম নিয়ে পেরেকের এত আগ্রহ কেন! বুঝতে পারলাম না, ওর গোলাপের পিছনেও কোনও কাঁটা লুকিয়ে রয়েছে কি না!

চার

'গোলাপটা যখন পাগড়ি মেলাবে দারুণ দেখতে লাগবে, না?' বিলু আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি বললাম, 'এত রোদের মধ্যে গোলাপ হয়?'

'শেষে সরিয়ে নেবে তো।' বিলু চট্টা ধরে ছায়েপে এক পাশের শেডের নিচে সরিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, 'যার থেকে কিনলাম সে বলল এগুলো নাকি বসরাই গোলাপ। খুব যত্নে রাখতে হবে।'

আমার হাই উঠল। দুপুর হলেই এত ঘুম পায়। এখনও আমার শরীর ভারতীয় সময়ের সঙ্গে খাপ খায়নি।

আমি ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে বারোটা যাচ্ছে। একবার বেরোতে হবে। টাকা তোলা দরকার। আসলে এখানে আসার আগে একটা জরুরি কাজ করব বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু সতি বলতে কী, কাজটা করব কি না সে ব্যাপারে এখনও মনটা ঠিক করে উঠতে পারিনি।

ভিসার প্রধান থেকে কবে মেল করবে কে জানে! তত দিন এই যে বসন্ত ঝড়টা, এটা খুব বিরক্তিকর। তার ওপর এত মানুষ চারদিকে। আঙ্গুলে-ওমশে থাকার পর অভ্যাসটাই বদলে গিয়েছে। ওখানে মানুষ একতরফে যে, নিজের মনে থাকা যায়। আর এখানে সবাই মনে হচ্ছে কোলে উঠে পড়বে।

সেদিন রাসবিহারী মোড় দিয়ে হেঁটে দেশপ্রিয় পার্ক অবধি গিয়েছিলাম। ওঃ, কী ভয়াবহ অভিজ্ঞতা! ফুটপাথ বলে কলকাতায় দশ বছর আগেরও যা ছিল এখন আর নেই! সব ড্যানিশ হয়ে গিয়েছে। মোবাইলের প্রোটোটাইপের দোকান, বেলনার দোকান, বাবার দোকান! আরও কীসব যে দোকান! আমি তো হাঁটতেই পারছিলাম না। বাবরার ধামতে হচ্ছিল। সরে, মাথা নামিয়ে, পাশ কাটিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল। ওঃ, সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা! এখানে কি কেউ নেই এগুলো দেখার!

তারপর রাস্তার অর্ধেক দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা সার-সার অটো! এখানকার মানুষের খেঁখি দেখার মতো। পরিষেবা ব্যাপারটাই যেন এ দেশে নেই। এখানে ক্ষমতাবান লোকেরা সবাই দয়া করছে সাধারণ মানুষের।

এই শহরে আমি থাকতাম। আমার সব কিছুই এই শহর ঘিরে তৈরি। আমার আনন্দ, আমার কষ্ট সব কিছু এই শহরের জল-হাওয়া পেয়েই বড় হয়েছে। আর দূরে যাওয়ার পর সেই ডালবাসা যেন বেড়েছে আরও, তাই এই সব অসভ্যতা দেখলে ভিতরটা ছলে। কিন্তু কী করব। কাকে বলব, বুঝতে পারি না। তাই ধীরে ধীরে ইনডিফারেন্স দিয়ে মুড়ে রাখতে চাই নিজেকে।

পরপর ছ'টা বি সরিয়ে বিলু একটা হাঁপাল। তারপর বলল, 'তোয় কী হয়েছ রে? তখন থেকে গ্যাটার মতো মুখ করে আছিস?' আমি বললাম, 'নাঃ, বাইরে বেরোব একটু তাই ডাবছি।'

'অ, বিলু বলল, 'তবে যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করিস। বাবা খুব টেনশনে আছে।'

শেডের তলার চারটে প্লাস্টিকের চেয়ার রাখা আছে। আমি তার একটার দিকে বসলাম।

বিলু হাতটা বাড়ল, 'বাবা খুব চাপে থাকে, জানিস তো।'

'কেন?' আমার ভাল লাগছে না, তা-ও জোর করে আগ্রহ

দেশানোর চেষ্টা করলাম।

‘ওই ডব্রলোক যার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে বলছে, লোকটা বাবার বস। বহুদিন বাবার প্রোমোশন আটকে রেখেছে। তাই... আমার খুব বাজে লাগছে। আমি জানি তুই বিয়ে করতে রান্না নেস।’

‘তাই?’ আমি হাসলাম।

বিলু বলল, ‘না হলে সেদিন ওরকম করে তাকালি কেন তোশানাদির দিকে?’

আমি এবার হিটকে উঠলাম ভিতরে-ভিতরে। বলে কী মেয়েটা। ও দেখল কী করে? আর কীভাবে তাকিয়েছি আমি?

আমি কিছুই হয়নি এমন করে বললাম, ‘তুই কী বলছিস?’

বিলু হাসল, ‘তোমার যা মনের কথা তা তো আমি জানি।’

আমি জানি এখানে আর কিছু বললে মেয়েটা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।

তাই কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়লাম।

বিলু বলল, ‘পালাছিস দাদাভাই? সেদিন ট্যান্সি থেকে নামলি।

তারপর সামনে তোশানাদিকে দেখেই তো একদম ধমকে দাঁড়িয়ে গেলি। তোশানাদি ট্যান্সি করে চলে যাওয়ার পরও তো দেখলাম তুই দাঁড়িয়ে আছিস। ডিক্টিংস! এটা কখন করে মানুষ? আমি কি ছোট আছি দাদাভাই? আমি বুঝি কিছু বুঝি না? কেন তুই এত দিনেও বিয়ে করিসনি, তারপর তুই খানি না আমি?’

আমি হেসে দরজার দিকে এগোলাম। বললাম, ‘এই তো বিয়ে করব বলে এলাম। পূজা বলে মেয়েটাকেই করব।’

‘তুই ওই রমেনবাটিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবি স্বত্তর বলে? সত্যিই?’ বিলু চোখ গোলা করে তাকাল আমার দিকে, ‘তুই জানিস তোশানাদির কেন ডিভোর্স হয়েছে?’

আমি বললাম, ‘বিলু, ড্রপ ইট। আমি এসবে নেই রে। আমি যাই এবার। বেরোতে হবে।’

‘দেখ দাদাভাই, শীতল আমার বন্ধু। আমি সবটা জানি। বাবা আমার আর পাকুর বিয়ে দেবার জন্য খরচের চিন্তা করে। তাই সবসময় টাকা টাকা করে আঁজকাল। আমার লজ্জা লাগে। তুই মিল্ক চাশপ পড়ে কিছু করিস না। আর...’

‘আর?’ আমি দরজার কাছ থেকে ছুক তুলে তাকালাম বিলুর দিকে।

‘তোশানাদিকে একবার...’ বিলু ফিক করে হাসল, ‘মুঠে আদ্যাম সাকার ফর হ্যাপি এভিং।’

ঘরে এসে আমি আলমারি খুলে জামাকাপড় বের করলাম। তখনই আবার চোখে পড়ল প্রিন্ট আউটটা। সেদিন ওই সোকানটা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। আমি ধমকে গেলাম একবার। আঁজ থেকে আট মাস আগে আমি ই-মেলে এসেছিল এটা। তা-ও ইউনিভার্সিটির ই-মেলে-ও। আমার তো খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তখন। এই মেল আইডি-টা পেল কী করে? তারপর মনে পড়েছিল, শুগলে আমার নাম লিখে সার্চ করলেই তো সব জানা যাবে। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা মেল। আমার ভিতরে রাগ পাকিয়ে উঠেছিল তখন। ভেবেছিলাম, সব তো শেষ হয়ে গিয়েছে, তার পরেও কেন অজীত পিছন ছাড়ছে না আমার! আমি আলমারিটা বন্ধ করলাম। রাগ ভাল জিনিস নয়। রাগ করলে শেষমেশ সব কিছু ভেঙে যায়, অনিষ্ট হয়। আমি ওই ই-মেলের কোনও উত্তর দিইনি। কিন্তু এই আট মাস ধরে নানা কাজের ফাঁকে আমি নিজেই বুঝিয়েছি। বুঝিয়েছি, জীবনটা হিম্বি হিম্বি বদলা নেওয়ার জায়গা নয়। আমার যতই কষ্ট হোক দামিছ আমি এড়াতে পারি না।

এইবার দেশে ফেরার আগে তাই মনে মনে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা আমায় নিজেকে দেখতে হবে। যাব একবার ওখানে।

কিন্তু কিছুতেই আমি সাহস তো জোগাড় করতে পারছি না। কিছুতেই বুকের ভিতরে সকলের অলঙ্কারে বেঁচে থাকা সেই সদ্য তরুণ রুকুকে মারতে পারছি না। তাই এখানে ক’দিন কেটে যাওয়ার পরও আমি

কিছুই করে উঠতে পারিনি এখনও।

জিনিস আর জামা পালটে আমি নিচে নামলাম। দেখলাম, বিলু এখনও ছাদে ওই টবগুলো নিয়ে পড়ে আছে।

আমায় দেখে হাসল। জোর গলায় বলল, ‘দাদাভাই, আমি কিন্তু লেগে থাকব তোর পিছনে। সেদিন তোদের কিন্তু আমি মিঠুদিদের ব্যালকনি থেকে দেখেছিলাম।’

দোতলায় গিয়েই আমি একটা গন্ধ পেলাম। ঘিয়ের গন্ধ। আমার গা গুলিয়ে উঠল। ছোট থেকেই ঘি আমার ভাল লাগে না। আর দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে এখন আরও ব্যাধি লাগছে।

‘কাকু...’ আমি কাকুদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গলা তুলে ডাকলাম।

‘আসছি, দাঁড়া,’ কাকু ভিতর থেকে উত্তর দিল।

আমি ব্যাধায়ায় সরে এসে বেগি থেকে ঝুঁক একতলায় তাকলাম। বাড়ির ছায়াটা দিনের এই সময় ছোটো উঠোনটায় পড়ে।

দেখলাম, কেমন যেন মলিন লাগছে সবটা। যখন ছোট ছিলাম, ক্লাস টু-থ্রি-তে পড়তাম, মর্নিং স্কুলের পরে ঠিক এই সময়ে বাড়ি ফিরতাম আমি। মা আমায় এই উঠোনে নাড় করিয়ে সর্বের তেল মাখিয়ে দিত। তারপর টাইম কলের পরে ঘি হাপুস-হাপুস করে স্নান করতাম। মা দূরে দাঁড়িয়ে আমায় দেখে হাসত খুব। বলত, ‘আর না, এবার বন্ধ কর। হয়ে গিয়েছে চান। আর করতে হবে না। উঠে আয় বাবা।’

আমি শুনতাম না। অ্যালুমিনিয়ামের মগ লোহার ছোট বালতিতে ডুবিয়ে খুব স্নান করতাম। লাফাতাম। আর জলের গুঁড়োর কিছুটা ছড়িয়ে পড়ত উঠোনে, কিছুটা গিয়ে লাগত মায়ের চোখেমুখে।

মা হাসত, বলত, ‘ঘাখো ছেলেকে। আরে, ওরকম করে লাফায় না। দিদির ডো আদ্যাম ভিজিয়ে।’

এবার যাকে দেখতাম আর আরও লাফাতাম। আরও জলের গুঁড়ো স্কোপ যেত মায়েদের মুখে। মা হাসত। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে দিত খুব। তারপর আমায় জোর করে টেনে আনত কাছে। গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিত। আমি গামছা নিয়ে সুপারমার্শনের মতো গলায় বেঁধে উঠোনময় বুরতাম। আর মা বুরত আমার পিছন-পিছন। তারপর ঘরে, জোর করে আলি দিয়ে মুছিয়ে দিত মাথা। আমি আর দাঁপ্পি করতাম না। মায়েদের গায়ের সঙ্গে বিড়ালের মতো জড়িয়ে থাকতাম। এলাচ-লবঙ্গের গন্ধ পেতাম একটা। আমার ঘুম চলে আসত। মনে হত এমন দুপুর যেন কোনওদিন না শেষ হয়। এমন ছায়া-ঘেরা উঠোনে যেন আমি মায়েদের কাছে থাকতে পারি সারাক্ষণ জীবন।

ছায়া বড় চক্কল। বড় পলকা। রোদের তাকে দখল নিতে সময় লাগে না। আঁজ, এত বছর পর শূন্য উঠোনটা দেখে বুকের ভিতর নিরালা দুপুরের তিত্তির ডেকে উঠল যেন। মায়েদের জন্য আমার বড় কষ্ট হল।

‘রুকু, বল এবার।’

আমি পিছনে ঘুরলাম। কাকু পাল্লাবি আর লুঙ্গি পরে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যাধায়ায়। মাথার অবশিষ্ট চুলগুলো পাট-পাট করে আঁচড়ানো। গলায় পুরনো জ্যাক বোর্ডের গায়ে লেগে থাকা চক্কর গুঁড়োর মতো পাড়াঘাত।

আমি বললাম, ‘বলবে তো তুমি!’

‘ও হ্যাঁ, তাই তো!’ কাকু মাথা নাড়ল, ‘বয়স হচ্ছে তো। তা, তুই কী ভাবলি? রমেনবাবুর মেয়ের ব্যাপারটা।’

আমি বললাম, ‘কাকু, বয়সে দশ বছরের ছোট মেয়েটা।’

‘তাতে কী?’ কাকু জোর দিয়ে বলল, ‘আরে, সেটাই তো ভাল।

মানে তুই অনেক বেশি বয়স অবধি...ইয়ে মানে...যাক, তুই কবে দেখা করবি? টিয়া ম্যাডাম তো খুব ধরছেন। তোকে গুঁর খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে তো।

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা গ্যাডাকলে পড়া গিয়েছে তো।

কাকু আবার বলল, 'ভাল মেয়ে। সুন্দরী। ফিগারটাও বেশ ইয়ে।
তোর ভালই লাগবে।'

আমার হাসি পেয়ে গেল। কাকু ডেসপারেট হয়ে উঠেছে। অফিসে
কাকু আকাউন্টসের কাজ করে, কিন্তু এখানে সেলসের কাজ করতে
হচ্ছে। অনভ্যাসের ফলে ঠিক বাগে আনতে পারছে না আমায়।

কাকু বলল, 'ভূই দেখ। ফাইন কোয়ালিটি। মাখনের মতো চামড়া।
কী সুন্দর চুল। আর চোখ। সে মানে ইয়ে একদম...'

আমার মনে হল কাকু পরদার কাপড় বিক্রি করছে।

বললাম, 'কাকু একটা এয়ার কুলার কিনব। যা গরম আমি পারছি
না থাকতে। এমি তো লাগানো খুব খামেলা, তাই কুলারে যতটুকু
হয়।'

'কুলার।' কাকু ইলেকট্রিক বিলের কথা ভেবেই হততো খাবি খেল।
কিন্তু আমি ছাড়লাম না। এটাই আমার সুযোগ। আমি কাকুর দিকে
তাকিয়ে রইলাম।

'তা মানে...'

আমি বললাম, 'যাওয়ার সময় বিলু পাকুদের ঘরে দিয়ে যাব।

আমি তো ওটা বইতে-বইতে শিকাগো নিয়ে যাব না।'

'তা বেশ, কিনিস। কিন্তু ওই শুব্বার ব্যাপারটা...' কাকু আমার জন্য
ফিল ইন দ্য ব্ল্যাক রেখে দিল।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, নেস্ট উইকে একদিন দেখা করব।

ডিসা আর কিছু পারসোনাল কাজ আছে। একটু সেরে নিই।'

কাকু গ্যালগ্যাল করে গলে প্রায় ড্রেন দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে
বলল, 'তবে রমেনবাবুকে বলে দিই তুই রাজি?'

আমি হাত তুলে কাকুকে ধামিয়ে বললাম, 'কাকু, দিল্লি দূর অস্ত।
আগে অডিটো-ডিস্যুয়াস হোক। পরে তো বাকিটা। শুধু বলো আমি
দেখা করি। কেমন?'

আমি আর অপেক্ষা না করে নিচে নেমে এলাম। কাকুকে হাত
সুযোগ দেব তার মতো খাবে। কাকুর কোথায় কী বাধ্যবাধকতা আছে
সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব কেন।

একতলায় ঠাকুমা এখন একা থাকে। বাকি ঘরগুলো বন্ধ। খোলা
হয় না। কারণ, এসব রক্ষণাবেক্ষণ করার লোক নেই।

আমি এখন সকালে ডারী ব্রেকফাস্ট করে নিই। তাই দুপুরে একটু
স্লুপ আর দুটো পড়িরাই খাই শুধু। সেটা আমি আগেই খুঁজে নিয়েছি।
তাই খামেলা নেই।

আমি ঠাকুমার ঘরে উঁকি মারলাম। ঠাকুমা ছোট টেবিলটায় বসে
বাঁসি। আমার লগ পেয়ে মুখ তুলল। হাসিতে মুখটা কুঁচকে গেল
আরও। বলল, 'আয়। বোস।'

আমি ছুটোটা খুলে ঘরে ঢুকলাম।

ঠাকুমা বলল, 'গতকাল আসিসনি কেন রে? এতদিন পর এগি,
তা-ও রোজ দেখা করিস না। কেন?'

বললাম, 'গতকাল একটু রাত করে ফিরিছি। একটা ফিল্ম দেখতে
গিয়েছিলাম। যখন ফিরেছি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে। তা, আমি এলাম
কারণ, তোমায় একটা কথা বলব। মানে, আমি তোমার কিছু দিতে
চাই। তোমার কী লাগবে বলো।'

ঠাকুমা বলল, 'দুপুরে শেয়েহিস? তোর কাকিমা ঠিকমতো রান্না
করে দেয়। আমায় যা পাঠায়, বিড়ালের মত। আমি বড়ি হয়েছি বলে
কি খিডটা করে হয়ে গিয়েছে নাকি? আমায় একদিন বিরিয়ানি
খাওয়ায় কি?'

আমি হেসে বললাম, 'খাওয়াব। শরীর খারাপ করবে না তো?
আর কী নেবে বলো?'

'কী নেব? ঠাকুমা সময় নিয়ে একটু ভাবল। তারপর বলল, 'এই
চ্যাপসা টিভিটার বদলে আমায় একটা এলইডি কিনে দিবি? আমার
খুব শখ। অ্যাডভাটাইজে দেখি। আর দুটো নাইটি। খুব পরায় ইচ্ছে।
দিবি রুকু?'

'এলইডি।' আমার খুব মজা লাগল, 'নাইটিও? গ্রেট। গত দশ

বছরে কলকাতার এটাই উন্নতি। ব্রাভো।'

আমি উঠতে গেলাম কিন্তু পারলাম না। ঠাকুমা আমার দিকে
তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আর দু'মিনিট বোস। তোকে সেই কথাটা
বলবে।'

আচমকা ঠাকুমা এমন করে গলা পালটে ফেলল যে, আমি অবাক
হলাম খুব।

আমি বললাম, 'সিরিয়াস কিছ?'

ঠাকুমা পাতে শেব কটা ভাত মুখে তুলে জল খেল। তারপর
একটু জল পাতে ঢেলে প্রণাম করে বলল, 'শোন তবে, আমায়
হয়তো তোরা কাকু খুন করবে।'

আমি হেসে ফেললাম, 'এসব তো আগে বলেছি। আর ঠাকুমা,
সলমন খান, শাহরুখ খানের ওই ছবিগুলো দেখা বন্ধ করো। কী বলছ
তুমি নিজে শুনছ?'

ঠাকুমা ডুক কুঁচকে বলল, 'পাকামো করিস না। এখানে থাকিস
তুই? আমি যা বলছি, শোন। নিজের পেটের ছেলে আমায় মারতে
চায় টাকার জন্য।'

'টাকা? তুমি তো বলো ঠাকুরদার পেশনন ছাড়া তোমার আর কিছু
জ্ঞানো নেই।'

'তুই বুঝিস না কেন? ঠাকুমা বিরক্তিতে মাথা নাড়ল, 'আরে
নীরজ সারদেশাই। ও তোর কাকুকে টোপ দিয়েছে। এই বাড়িটা
কিনবে। তারপর ভেঙে ফ্ল্যাট করবে। বসেছে তিরিশ লাখ টাকা দেবে,
সঙ্গে একটা সাড়ে সাতশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। তুই বল, এই
অকলে তিনতলা বাড়ি, উঠান নিয়ে তিরিশ লাখ? এর দাম এক
কোটি তো হবেই।'

আমি ছোট কামড়ে তাকালাম ঠাকুমার দিকে। আমার পেরেকের
মুখটা মনে পড়ল।

ঠাকুমা বলল, 'তোরা কাকু তো আমায় চাপ দিচ্ছে খুব। ও যে ফ্ল্যাট
খাবে, সেটা তো পায়দার বাসা। আমি কোথায় থাকব? আর তুই?
একটা ভাগ তো তোর। তোর থেকে বাবা-বাহা করে তোর পাটটা
লিখিয়ে নেবে। সে হয় নাকি। আমি বলেছি এটা অন্যায়। ও বলে
রুকুর টাকার দরকার নেই। ডলারে কামায়, গুর আর চিন্তা কী? কিন্তু
তুই বল রুকু, তোর না হয় দরকার নেই, কিন্তু তোর...'

আমি ঠাকুমাকে শেব করতে দিলাম না কথাটা। উঠে পড়লাম।

ঠাকুমা রমকাল এবার। তারপর ভাল করে আমার মুখের দিকে
তাকাল। আমার মুখটা দেখে বুকল, কেন টট করে উঠে পড়েছি আমি।

ঠাকুমা বলল, 'রাগ করিস না বাবা। একা বড়ি-মানুষ থাকি।
পেটের ছেলে খুন করে সব হাতাতে চায়। তোকে ছাড়া কাকে বলব
বল।'

আমি বললাম, 'তোমার টিভি এনে দেব ঠাকুমা। বিরিয়ানি আর
নাইটিও বাকিটা জানি না কী হবে। ডিসা হলে আমি চলে যাব।
এখানকার কোনও কামেলায় আমি নেই। শুধু একটা কথা বলি,
তোমার জিনিস তুমি না চাইলে কেউ জোর করে নিচ্ছে পারবে না।'
বড়রাস্তায় এটিএম থেকে টাকা তুলতে হবে আমায়। তারপর
ভাবছি একদার যানপায়ে যাব। কলেজের এক বন্ধু থাকত। তার সঙ্গে
দেখা করব। ও উকিল।

বাড়ির রাস্তা থেকে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিলাম। আর সঙ্গে-
সঙ্গে সারা শরীরে কেমন যেন চিড়ি করে শক খেললাম।
দুপুরের নির্জন পাড়া। চারটে বুকুর শুধু কুতুপী পাকিয়ে শুয়ে
আছে রাস্তার পাশে। বড় গুলমোহর গাছে বসে একটা কাক প্রাণপণে
ঠেচিয়ে চলেছে। আর মোড়ের মাথায় রিকশা থেকে নেমে ভাড়া
মেটাচ্ছে তোশানা।

আমি দোনোমনো করলাম। গুর সামনে দিয়ে যাব? বড়রাস্তায়
যেতে গেলে গুর পাশ দিয়েই যেতে হবে। নাকি ফিরে গিয়ে দশ
মিনিট পর বেরোব?

কিন্তু নিজেই বকা দিলাম। খুব বোকার মতো হবে দ্বিতীয়

www.amarboi.com ~

আজ্ঞাও তেমনই ঘুরছিলাম একা-একা।

সামনে পুজো। কলক্স স্কোয়ারের প্যাভেল বার্ষিক বাঁধা হয়ে গিয়েছে। রাস্তা বুড়ে শালখুটি পোতা হচ্ছে। এতে বার্ষিক লাগিয়ে ব্যারিকেড বসানো হবে।

তার মধ্যেও বই কেনোবেচার ভিড় লেগেই আছে। সোকানদারদের ঢাকাডাকি, মুটেদের দৌড়, ডাননে করে বইয়ের প্যাঁকেট নিয়ে পার্শ্ব-পূর্ন, আর এই সব কিছুকে চারিদিক থেকে বৃদ্ধ পিতামহের মতো খিরে থাকা পুরনো বাড়িঘরের সারি।

আমার আজ বই কেনার নেই। জিনিতা বলেছিল ওর এক ঘণ্টা মতো সময় লাগবে। হয়ে গেলে ও একটা মিসড কল দিয়ে দেবে আমায়। তখন আমি যেন কফিহাউজের সামনে এসে দাঁড়াই।

তেমনই আমি এমিক-ওমিক ঘুরেছি গত এক ঘণ্টা। একটা ভুট্টা খেয়েছি। কলক্স স্কোয়ারের জলে ওয়াটার পোলো দেখেছি। তারপর কফিহাউজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি জিনিতার মিসড কল পেয়ে।

জিনিতা একটা স্টেট কয়ার এটা ওর স্বভাব। তাই জানি, আসতে একটা দেরি হবে ওর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তার ভিড় দেখছিলাম। ট্রাম-বাসের জট দেখছিলাম। সামনের ছোট বইয়ের সোকানদার দূটো মেয়ের একটা বই নিয়ে সোকানদারের সঙ্গে প্রাণান্তকর দরাসরি দেখছিলাম।

ঠিক তখনই পিছন থেকে শুনেছিলাম একটা গলা, 'কী, মেয়ে দেখা হচ্ছে?'

আমি চমকে উঠে ঘুরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, তোশানা।

তোশানা কলক্স দেখলেই আমার বৃত্তা কীরকম যেন কেঁপে ওঠে। মনে হয় মাঝরাতে স্টেশন কাঁপিয়ে যেন মেল ট্রেন চলে গেল।

আজ্ঞাও তাই হয়েছিল ওকে দেখে। আর এখনও হচ্ছে। কিন্তু আমি সেটা কখনওই বুঝতে পারি না ওকে। আজ্ঞাও দিচ্ছি না। ভাব-ভালবাসা নিয়ে ছোটবেলা থেকেই আমার একটা ভয় আছে। না, নিজের জন্য নয়। আমি কোনওদিন ওসব করিনি। ভয়টা হয়েছে আমার মা-বাবাকে দেখে। ওদেরও তো প্রেমেরই সম্পর্ক ছিল।

আমার মনে হয় ভালবাসা জিনিটটা খুব একটা কাজের নয়। বরং সমস্যাই তৈরি করে বেশি। তাই ছোট থেকে নিজেই নানাভাবে নিজের টিকাকার করার চেষ্টা করে গিয়েছি। আর সত্যি বলতে কী এতদিন সেই ড্যাকসিনেশন কাজও করেছে ডাল। কিন্তু তোশানার সামনে আসার পর থেকেই গোলমালটা শুরু করেছে মন।

'কী হল। জানা আছে মোবাইল নাশার?' তোশানা এবার আমার হাতটা ধরে বাকাল।

আমি কারেন্ট খেলায় যেন, ওই হাত আমায় ধরেছে। দেখলাম, ওর সঙ্গে দাঁড়ানো চারটে মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সকলের চোখেই কৌতূহল আর চাপা হাসি। তোশানার মতো মেয়ে যেতে আমায় মোবাইল নাশার দিতে চাইছে।

আমি বললাম, 'না নেই। কে দেবে?'

তোশানা বলল, 'নেওয়ার ইচ্ছে থাকলে আমাকেই বলতে পারতে। আমি যেতে বলছি বলে দয়া করে নিচ্ছ নাকি?'

মহা মুশকিল। এ মেয়ে তো নিজেই আমি নিজেই বাজায়।

'আমার মোবাইল নাশারটা গিয়ে। তুমি আমায় মিস কল দিয়ে দাও। সেড করে নেব,' আমি মোবাইলটা বের করলাম।

তোশানা টকটক করে আমার বলা নম্বরটা টিপে ডায়াল করল। আমি ওর আঙুলগুলো দেখলাম আবার। ভগবান! কাঙালকে কেউ শাকের খেত দেখায়।

নাশার সেড করার পর আমি বললাম, 'তুমি এখানে পড়ো জানতাম না তো।'

'কিছুই তো জানো না। জি কে এক কত' তোশানা এবার আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশের মেয়েগুলোকে বলল, 'তোরা যা, আমি আসছি একটু পরে।'

মেয়েগুলো হাসল। তারপর নিজেদের মধ্যে গুজুগুজু করতে-

করতে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ওইদিকে।

আমি জিন্সেস করলাম, 'এরা তোমার বাব্বী!'

তোশানা পাশা না দিয়ে বলল, 'তুমি কার জন্য অপেক্ষা করছ এখানে?'

'জিনিতা', হোট করে উত্তর দিলাম আমি।

সবু-সবু তোশানার মুখটা পালটে গেল। এতক্ষণের ইয়ার্কির মুখোশের তলা থেকে যেন বেরিয়ে এল গভীর একটা মুখ। ও বলল, 'ও তাই বলো। প্রেমিকার জন্য!'

'কে প্রেমিকা?' আমার বিরক্ত লাগল, 'আমার সঙ্গে পড়ে।

ওইদিকে থাকে। গাড়ি করে সঙ্গে নিয়ে যায় আমায়। আর কিছু নয়।'

তোশানা হির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে, তারপর বলল, 'কেমন ছেলে তুমি? লজ্জা করে না তোমার? একটা মেয়ের ঘাড়ো

চেপে যাও? বাস, ট্রেন, মেট্রো নেই? তাতে যেতে পারো না? একটা মেয়ের সঙ্গে গাড়ি করে যাবে বলে বাবু অপেক্ষা করছেন। জান,

আসানদারের থেকে রোজ কত লোক কলকাতায় ডেলিপ্যাসেঞ্জার করে। আর তুমি। আসলে তা নয়, তোমার ওকে পছন্দ। না হলে কোনও মেয়ে রাস্তা বয়ে বাড়ি দিয়ে যায়? আমি বুঝি না কিছু, না?'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তোশানার দিকে। ফরসা মুখ গোলাপি হয়ে গেছে উত্তেজনায়। গলার স্বর চড়ে গেছে। আশপাশের লোক তাকান্ধে আমাদের দিকে।

একটা ছেলে তারই মধ্যে এগিয়ে এল সামনে। তারপর কড়া চোখে আমায় মেপে নিয়ে তোশানার দিকে তাকিয়ে মিহি গলায় বলল, 'ইক বি ডিটার্ভিং ইউ?'

তোশানা এক ঝটকায় ছেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নো, ইউ আর। ডায়-ইউ!'

ছেলটাই তার অশুশ লেজ গুটিয়ে সরে গেল সবু-সবু।

তোশানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাড সাম সেন্সুয়াল প্রপারটি? ও হেল্ল করছে মানেই হেল্ল নিতে হবে? সত্যি তুমি একটা...'

আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম, 'বাজে ছেলে, তাই তো?'

তোমার মা তো বলেইছেন!'

'কে কী বলেছে রে?' হস্তদণ্ড হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল জিনিতা। সামান্য হাঁপাচ্ছে।

তোশানা ঘুরে দেখল জিনিতাকে। আর ঠিক তখনই বিকেলের আলো এসে পড়ল তোশানার গালে। হালকা বাদামি রোম, গোলাপি গা। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল দুই মাইক্রো সেকেন্ডের জন্য। আমি মনে-মনে টেঁচিয়ে বললাম, ভগবান, ও ভগবান! আর বাড়াবাড়ি কোরো না শুরু।

জিনিতাকে দেখে নিজেই সামলে নিয়ে চোয়াল শক্ত করল তোশানা।

জিনিতা হাত দিয়ে নিজের এলোমেলা চুল ঠিক করে বলল, 'সরি রকু, দেরি হয়ে গেল রে। তোকে মিসড কল দিয়ে উঠতে যাব এমন সময় মেশো ফিরল অফিস থেকে। চিকেন কাটলেট আর ফিশ ফ্রাই নিয়ে এসেছে। না খায়ে ছাড়বে না। আমি তোকে বাস দিয়ে কী করে খাই বল। মাসিকে বলে তোর জন্যও নিয়ে এসেছি। এই দেখ। গাড়িতে বসে খেয়ে নিবি।'

আমি ঢোক গিলে তোশানার দিকে তাকালাম। জিনিতাকে এসব কে করতে বলে। আর করবি তো কর একদম তোশানার সামনেই করতে হবে। ফিশ ফ্রাই। চিকেন কাটলেট। এর চেয়ে তো পাঁচ টাকার তুঁতে আনতে পারত।

তোশানা আমার দিকে তাকিয়ে মাইনাস কুড়ি ডিগ্রির গলায় বলল, 'হ্যাড ফান!'

আমি কেঁপে গেলাম। এ তো ফান নয়, এ বিপদান।

জিনিতা তোশানার দিকে তাকাল এবার, 'তুমি সেই মেয়েটি না। সেদিন লাইব্রেরির সামনে দেখেছিলাম।'

তোশানা উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমি আজ আসি।'

আমি বললাম, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? মনে গাড়িতে করে...'

'আজ্ঞে না।' তোশানা আমায় কথা শেষ করতে দিল না,

'কলকাতায় আজ পরিবহণ ধর্ম্যত নয়।'

আকাশি চুড়িদার কুর্তা আর সালা ওড়না উড়িয়ে সামনের ভিড়ের ভিতর গিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল তোশানা। আমি তাকিয়ে রইলাম। দেহলাম, রাস্তার অন্য ফুটপাথে উঠে আমার দিকে ফিরল ও। আর ফিরেই চোখে চোখ পড়ে বাওয়ায় প্রথমে অপ্রস্তুত হল একটু। তারপর ঠোঁট টিপে মাথাটা একটু উপরে উঠিয়ে একটা অবজার ভাব দেখিয়ে চলে গেল কলকাতার গেটের ভিতরে। কলেজ ষ্ট্রিট মুহুর্তে জনশূন্য হল।

জিনিতা আমায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'কী রে, মুঠি হয়ে গেছি যে। সেখিন, মাথায় না আবার কাক বসে পটি করে দেয়।' আমরা দুজনে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামলাম। গাড়িটা পাশের একটা রাস্তায় রাখা আছে। ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগোতে-এগোতে আমার চোখের সামনে তোশানার চলে যাওয়াটা ভেসে উঠল আবার। মেয়েটা খুব রেগে গিয়েছে। কিন্তু কেন।

কারণটা কি আমি জানি না? আসলে কারণটা আমার মনের ছোট্ট একটা কোনোয় ডিকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। একটা কর্পূর-গন্ধের ভালগাণা হাত বাড়তে চাইছে, কিন্তু তা-ও আমার সেসব বিশ্বাস হচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে তোশানা আর আমি। ও আমার জন্য। ধ্যান? কল্পনাতে বি খাওয়াই যায়, তারপর বাস্তবে যখন সেই পেন্সের খোল আর ভাত এসে পড়ে, তখন যে খারাপ লাগটা আসে, সেটা সামলানোই যায় হয় ওঠে। তাই নিজের মনকে বাঁচাতে কাল্পনিক বি একসময় পাতে নেওয়া উচিত নয়।

রাস্তায় ভিড়টা আরও বেড়েছে যেন। মটুরা বস্তা মাথায় একটা অদ্ভুত শব্দ করে হটিছে। আশপাশের সোকানদাররা চিৎকার করছে। মটো গাড়ি আর একটা ছোট টেম্পো টুকে পড়েছে এই ভিড়ের মধ্যে। আর এলবের ভিতরে কমা, সেমিকোলনের মতো মানুষজন তো আছেই।

চারদিকে সব কিছুই আছে, কিন্তু আমি নেই। এসবের মধ্যে কোথাও নেই আমি। আমার মন আসলে তোশানার পিছুই নিয়েছে। যেন। যেন আমি সেখতে গাড়ি কলেজ টুকে ওই বিশাল সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠে গেল তোশানা। সেখতে পাখি ক্লাসে টুকে ব্যাটটা তুলল ডেস্ক থেকে। তারপর জানালা দিয়ে তাকাল বাইরের কুকুড়ার ডালে এসে বসা বুলবুলি পাখির দিকে। চুলটা ঠিক করল একবার। তারপর হাতে নিল মোবাইল। কুটকুট করে কাকে যেন মেসেজ করল একটা।

আর সঙ্গে-সঙ্গে সত্যি আমার প্যাণ্টের পকেটে নড়ে উঠল মোবাইলটা। আমি ঘাবড়ে গেলাম। তোশানা কি?

নাঃ! সার্ভিস প্রোভাইডারের মেসেজ। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। আসলে মটোকে শব্দ করতে চাইছিলাম, কিন্তু বায়বীয় জিনিসকে জমাত করার কায়দা তো এখনও রপ্ত হয়নি তাই চোয়ালের উপরেই আমার সত্যমের চেষ্টা প্রয়োগ করলাম।

'কীরে, হটিতে-হটিতে গাড়ি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস যে। দাঁড়া,' পিছন থেকে জিনিতা জামা চেপে ধরল আমার।

আমি থতমত খেয়ে দাড়িয়ে পড়লাম। সত্যি, গাড়িটা ছাড়িয়ে এসেছি। কী হয়েছে আমার?

জিনিতা বলল, 'কী হয়েছে তোরা? এমন খেঁটে আছিস কেন?'

আমি কিছু না বলে চুপচাপ গাড়িতে উঠলাম। জিনিতাও আমার পাশে উঠে বসল। মাথার চুলটা কানের পিছনে নিয়ে বলল, 'রুসু, আমায় না বললে বুঝব কী করে? কী হয়েছে তোরা?'

আমি উত্তর না দিয়ে জিনিতায় হাত থেকে খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে বললাম, 'বিশে পেয়েছে। জানিস তো বিশে গলে আমার কেমন সব গুলিয়ে যায়।'

জিনিতা তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি দীর্ঘশ্বাস চেপে বাইরে তাকলাম। মনে হল এই ভিড়ের মধ্যেই কোথাও এখন আছে

তোশানা। কিন্তু আমি পৌছতে পারছি না ওর কাছে।

রাস্তায় ভিড় থাকলেও আজ সিগনালগুলো খোলা পেলাম পরপর। গাড়িটা মসৃণভাবে শিয়ালদা ব্রাইওডার পেরিয়ে গেল।

জিনিতা বলল, 'তোরা মনে আছে তো নেস্ট উইক কী?'

আমি জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকিলাম। এবার মুখ ফেরালাম জিনিতার দিকে। বললাম, 'মহানন্দা!'

'দূর ব্যাঙ,' জিনিতা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার গালে লেগে ধাক্কা খাবারের একটা টুকরো তুলে নিয়ে নিজের মুখে পুরে বলল, 'এত বড় হডোয়স এখনও এমন করে খায়। সত্যি।'

আমি বললাম, 'পারের সপ্তাহে কী?'

জিনিতা বলল, 'গিলে বস। গিলে ভজনিদি। মনে আছে তো?'

'তোরা বাবার জন্মদিন।'

'হ্যাঁ। প্রতিবারই তো তুই আসিস। ভুলে যাস কী করে? জিনিতা সামান্য রাগ দেখাল।

আমি কিছু না বলে বাইরের দিকে তাকলাম আবার।

জিনিতা আমার গাল ধরে নিজের দিকে মুখটা ফিরিয়ে বলল, 'তোকে আসতে হবে। বাবা উইল বি ফিফটি ফাইভ। পাঁচটা বড় করে করছি এবার। রেস্টুরেন্ট ভাড়া করেছি আমরা। পার্ক স্ট্রিটে। মুখেছিস। তোদের বাড়ি গিয়ে বস। কাকু-কাকিমাকে নিয়ে আসবি। আমি কোনও কথা শুনব না।'

আমি শুটিয়ে গেলাম একটু। কী বলছে জিনিতা। বাবা মাকে নিয়ে আসব। আমি খাওয়া শেষ করে হাতের প্যাকেটটা সাইড ব্যাগের সামনের চেনে ঢুকিয়ে রাখলাম। রাস্তায় থেখানে-সেখানে নোংরা ফেলা আমার ভাল লাগে না।

জিনিতা বলল, 'কী রে, কিছু বল?'

আমুদে মাথা দপসপ করছে। এই মেয়েটা এত কথা বলে কেন।

মাথা ফিরিয়ে দেয় একেবারে। আমি মরছি আমার জ্বালায় আর ও আশ্চর্যভোর জন্মদিন নিয়ে আদিখ্যেতা করছে।

আমি চোখটা বন্ধ করলাম। আবার চোখের সামনে দপ করে লাফিয়ে উঠল তোশানার ঠোঁট টিপে মাথাটা উঁচু করে ওই মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা। কাকে মেসেজ করল তোশানা? বুকের ডেভের ৯-কারের মতো হল ফোটালা একটা হিন্সুটে কোথাও বিয়ে।

জিনিতা বলল, 'কী হল কী তোরা? কোনও রেসপন্স নেই।'

আমি বললাম, 'বাবা নিচ্ছই। কিন্তু বাবা তো কলকাতায় নেই।

আর মা কোথাও যায় না।'

জিনিতা বলল, 'বললেই হল। কাকিমাকে আমি গিয়ে বলব।'

আমার বিরক্ত লাগল খুব। জিনিতাকে কী বলছি ও শুনছে না।

আমার বাড়ির কী অবস্থা তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। বললাম, 'জিনিতা শোন, মা কোথাও যায় না। শুধু-শুধু গিয়ে বললে মা অপ্রস্তুত হবে।'

আমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে জিনিতা চুপ করে গেল একটু। তারপর সাবধানে বলল, 'তুই যান করলি?'

আমি মাথা নেড়ে 'না' বলে বাইরের দিকে তাকলাম। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না একদম। সাইলেন্স ব্যাপারটা কেউ জিনিতাকে শেখায়নি। সব সময় কথা ভাল লাগে নাকি। মনে হল তোশানার ক্লাসরুমের পাশে কি সত্যিই কুকুড়া গাছ আছে?

জিনিতা আরও কিছু বলল। কিন্তু আমি শুনলাম না। মনে-মনে দেখলাম, তোশানা মেয়েটির দিকে হটিছে। একা।

গাড়ি মিষ্টো পার্ক থেকে বা দিকে বাক নিল এবার।

পূজোর ব্যাক্স। ফুটপাথ উপরে লোক এসে পড়েছে রাস্তায়।

সত্যি, মানুষের কোর শেষ নই। জিনিস কিনলেই কি মনে আনন্দ আসে? এই যে কোটি-কোটি টাকার পুজো। এত আলো, মোশনাই, এত জলমলানো দিন, এতে কি সত্যি আনন্দ হয় কারও?

আমার নিজের জীবন তো রাশিধান নভেলের মতো। ঠাণ্ডা,

অঙ্ককার আর ময়াল সাপের মতো ধীর। আমি কেন এই সব আলো থেকে আনন্দ খুঁজে পাই না। আমি কি ফোটা-সেনসিটিভ নই?

বাইরের রঙিন কলকাতার ছবি দেখতে-দেখতে আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে এল। নিজের জীবনের অঙ্ককারটা যেন আরও বেশি করে স্পষ্ট হল চোখের সামনে। 'প্যারাডাইস লস্ট'—এ পড়া 'ডার্কনেস ডিক্টিবল' ব্যাপারটা এখন যেন বুঝতে পারলাম।

বাবা সেই যে অফিসের টুরের নাম করে বেড়িয়েছে, এখনও ফেরেনি। মা এর মধ্যে দু'দিন বাড়িতে খুব গভঃশাল করেছে এই নিয়ে। আমি শুধু বোঝানোর চেষ্টা করছি, আর চুপচাপ সব সহ্য করে গিয়েছি।

গাড়িটা যত বাড়ির কাছে চলে আসছে, আমার মনখারাপ যেন তত বাড়ছে। অঙ্ককাল বাড়ি ফিরতে ভয় লাগে আমার। বাবা আর মা এমন শরুপক হয়ে গেল কী করে?

গত পরশু মায়ের উপর বিরক্ত হয়ে আমি বলেছিলাম, 'বাবা যখন খারাপ জান, তখন ডিভোর্স করে দিচ্ছ না কেন? কেন পড়ে আছ এখানে?'

মা রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলেছিল, 'তোমার বাপ আমায় নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। আমি কেন ডিভোর্স করব? কেন করব? আমি মরে যাব, কিন্তু তোমার বাপকে ছাড়ব না। আমি ডিভোর্স করলেই তো আর-একটাকে জোতাঁবে। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

আমি বলেছিলাম, 'মা, কেন তুমি বাবাকে সম্বোধন করো? কোনও প্রমাণ আছে তোমার কাছে? শুধু-শুধু অশান্তি কোরো না তো।' মা শুধু বলেছিল যে, সব কিছুই প্রমাণের দরকার হয় না।

বাড়ির মোড়ের কাছে গাড়ি থেকে নেমে আমি আর জিনিতার দিকে তাকালুম না।

জিনিতাও আমার মুড় দেখে কিছু বলল না। শুধু 'আসি' বলে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে হয়ে গেছে। রাস্তার আলো ছলে উঠছে। আমি বড়রাস্তার মোড় দিয়ে না গিয়ে শটকাট ধরলাম।

সরু গলিটার ডেডের ঢুকতেই 'টিউ টিউ' করে সাইকেলের বেলটা শুনেতে পেলাম। আমি সরে দাঁড়লাম রাস্তার এক পাশে। খিটখিটমল যাচ্ছে।

খিটখিটমল পাশ দিয়ে যেতে-যেতে বলল, 'রাস্তার পাশ দিয়ে হাটতে হয় এই গর্ভঃগুলোকে কেউ শোখায়নি। সব আবার কলেজে পড়ে।'।

ভাবলাম, একটা আখলা ইট তুলে ছুড়ে মারি সাইকেলে। শালা, কাজের কাজ কিছু নেই, সাদামানি শুধু ক্রিটিক সেজে মুখে বোঝানো।

সাইকেলটা বেরিয়ে গেলে আমি জোরে পা চালানলাম।

বাড়িটা আজ যেন জলে ডুবে রয়েছে। এমন শান্ত পরিবেশ বহদিন দেখিনি। আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে দোতলার দিকে তাকালুম। কাকুদের বারান্দায় আলো জ্বলছে। উঠানের রকুটায় হাত ধুলাম। তারপর জল নিয়ে মুখে আর ঘাড়ের পিছনে দিলাম। শরীরটা ভাল লাগছে না।

এই করে ছোটবেলায় মর্নিং হুজ থেকে ফিরে স্নান করতাম। মা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার দেখত আর ঘোঁষালে একটা গ্রুপ ফোটো আত্মে। আমি, বাবা আর মা। দেখলে মনে হয় রূপকথার ছবি।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে বারান্দায় দাঁড়লাম একটু। ঠাকুরার ঘরে টিউ চদাচ্ছে। আমি কোনওদিকে না গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে ব্যাগটা রাখলাম টেবিলে। তারপর মোবাইলটা বের করে দেখলাম। তোশানা কি এসেছে কলেজে?

গাথা! নিজেকে গালি দিলাম আমি। বড় ওভার অ্যাকটিং করে ফেলছি। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমি মোবাইলটা চার্জে বসিয়ে মায়ের ঘরের দিকে গেলাম এবার। ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। দরজাটা খোলা। আমি মোটা

পরদাটা সরিয়ে মাথা বাড়ালাম, 'মা।'

'জুহু!'

মায়ের গলাটা শুনে আমি ঝাঝে গেলাম বেশ। কী হয়েছে মায়ের? এমন কাঁপা গলায় কথা বলছে কেন? আত্ম কি আবার ওই সব ঝেঁয়েছে নাকি? মা আমার একটাও কথা যদি শোনে।

আমি ক্রুত ঘরের ভিতর ঢুকলাম। দেখলাম, বিছানার এক কোনায় বসে রয়েছে মা। চুলগুলো এলোমেলো। চোখে কেমন যেন ফাঁকা দৃষ্টি। পাশে একটা অর্ধেক খালি মদের বোতল। সারা ঘরে অ্যালকোহেলের ঘন গন্ধ পাক মারছে।

আমি মায়ের কাছে বসে বললাম, 'কী হয়েছে মা? আত্ম আবার এসব ঝেঁয়েছে?'

মা আমার দিকে তাকাল এবার। মেলায় হারিয়ে যাওয়া ব্যাক্স মেয়ের মতো মুখ মায়ের। চোখে জল। মা বলল, 'জুহু, সর্বনাশ হয়েছে। তোমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।'

'মানে?' আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আমার শরীরে উনিশটা শজার চমকে উঠল একসঙ্গে।

মা হাতে ধরা একটা কাগজ এগিয়ে দিল আমার দিকে। তারপর বলল, 'এই দেখ। ঠিকানা। পেয়েছি তোমার বাবার একটা প্যাটের ভিতর থেকে।'

আমি কাগজটা নিলাম। উত্তর কলকাতার একটা ঠিকানা। এটা থেকে বাবা চলে গেছে কী করে মনে হল মায়ের?

মা এলোমেলো গলায় বলল, 'তোমার বাবা টুরে যাবনি। আমি অফিসে ফোন করেছিলাম। টুরে যাওয়ার নাম করে অন্য কোথাও গিয়েছে। এই দেখ, এটা মেয়েলি হাতের লেখা। আমি জানি এটা তোমার বাবার প্রেমিকার হাতের লেখা। জুহু...তুই একটু যাবি রে এই ঠিকানায়...জানো...ওখানে গিয়ে ফিরিয়ে আনবি তোমার বাবাকে? তুই ছাড়ো আমার তো কেউ নেই জুহু। আমি তোমার পায়ে পড়ছি। একবার ফিরি?'

পাঁচ

কাগজটা খুলে আমি দেখলাম। চিঠি আর ঠিকানা। কিন্তু কোনও ফোন নম্বর নেই। আট মাস আগে এই চিঠিটাই এসেছিল আমার ই-মেলে। তখনই ঠিক করেছিলাম কলকাতায় গেলে একবার যাব ওখানে। কিন্তু এখনও ঠিক মনটা শক্ত করে উঠতে পারিনি।

কিন্তু আর দেরি করলে হবে না। ঠিক যখন করছিই যাব, তখন কাজটা সেয়ে ফেলাই ভাল। আমি আবার গড়লাম চিঠিটা। ইংরেজি হরফে বাংলায় লেখা চিঠি। ঠিকানাটায় দেখতে পাচ্ছি আমহার্স্ট স্ট্রিটের কথা লেখা আছে। মানে সেই উত্তর কলকাতায়।

এক সময় আমার গোটা দিনের বেশির ভাগটাই কাট ওই দিকে। কিন্তু এই দশ বছরে অনেক কিছুই তো পালটে গিয়েছে। উত্তর কলকাতাও কি পালটেছে?

আমি ডায়ারির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালুম। দুপুরের দরজায় পাকা কমলালেবু রঙের রোদ নিয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে বিকেল।

নাগরদোলায় চাপলে যেমন হয় শরীরের ভিতরটায়, ঠিক তেমন লাগছে। এতদিন পর কীভাবে মুখোমুখি দাঁড়াব গিয়ে? কী বলব? কী দিয়ে শুরু করব কথা? বুকের ভিতরের তোরঙ্গে জমে থাকা সব রাগ আর অভিমান কি নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে? কেন এমন হল আমার সঙ্গে, সেই কথার উত্তর চাইব কি? বলব কি, 'তুমি আমার সঙ্গে এমন কেন করলে বাবা?'

অনেক ছোটবেলায় আমি বাবার খুব ন্যাওটা ছিলাম। মা একবার ঠাকুরা কাকুদের সঙ্গে আমায় নিয়ে দার্জিলিং ঘুরতে গিয়েছিল। বাবা যাবনি। আমার খুব আত্মভাব হয়ে পড়ে সেই হোটেলটাকে, যেখানে আমরা উঠেছিলাম। বড় গোট। গোটের পাশে রকটের মতো দেখতে একটা গম্বুজ। তারপর উঠোন। তাকে ভিনবিকি ঘিরে থাকা

দিনতলা হোটেল।

আমরা দিনতলার একটা ঘরে ছিলাম। ঘরের সামনে গোল ব্যালকনি। দাঁড়ালেই কানুনজনা দেখা যায়।

কিন্তু আমার ভাল লাগছিল না একটুও। আমি শুধু সারা হোটেল ঘুরে বুঝছিলাম বাবাকে। এ ঘরে চলে যাক্ষিলাম, ও ঘরে চলে যাক্ষিলাম। কখনও ছোট-ছোট পায়ে নেমে যাক্ষিলাম নিচে। খালি মনে হচ্ছিল বাবা কোথায়?

আমি মাকে, ঠাকুমাকে, কাকুকে প্রশ্ন করে-করে নাচ্ছেহাল করে দিয়েছিলাম। 'কেউ শাস্ত করতে পারছিল না আমায়।

এমন করে দু'দিন কাটার পরে এক রাতের খুম জ্বরে এসেছিল আমার। ডাক্তার ডাকা হলোও, জ্বর কমছিল না কিছুতেই। আমি শুধু এপাশ-ওপাশ করতে-করতে বাবাকে ডাকছিলাম। ছোট দুটো হাত বাড়িয়ে পাশে বুঁজছিলাম বাবার হাত।

ঠাকুমা আর দেরি করেনি। পরের দিন সকালেই হোটেল থেকে ফোন করেছিল বাবার অফিসে। তারপরে একটা রুপকথা। যে ঘরেছিল তাকেই ঠাকুমা বলেছিল আমার কতটা শরীর খারাপ হয়েছে।

বাবা খবরটা পেয়েছিল বিকেলে। তারপর আর সময় নষ্ট করেনি। সোজা শিয়ালদায় এসে ধরেছিল ট্রেন। সারা রাত জেনারেল কমপার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাববেলা এসেছে পিঁপেয়েছিল বাবা। তারপর সেখান থেকে গাড়ি ধরে সোজা দার্কিলিং।

হোটেলো তো ঘষা কাচের ওপারের একটা রূপকথা। স্পষ্ট করে মনেই পড়ে না কিছু। শুধু গল্পগুলো বহুবার শুনতে-শুনতে মনে হয় যেন সব দেহতে পাখি চোখের সামনে। মনে হয় খুম জ্বরের মধ্যে বাবা এসে ঠাণ্ডা হাতটা দিয়েছিল মাথায়। 'বাবু, এই তো আমি,' বলে জ্বরে ঢলে পড়া আমার শরীরটা তুলে আঁকড়ে ধরেছিল নিজের বুকের সঙ্গে।

আমি আজও চোখ বুজলে সেই বুক থেকে ভেসে আসা বাবার গন্ধ পাই। আজও শুনতে পাই বাবার বৃক্ক শুশুম্বল করে ছুটছে মাঝরাতে ট্রেন। আর তার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাবা। একলা আমি আজও ছোট-ছোট হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরি বাবাকে। অশ্রু দিয়ে বলি, 'তোমাকে ছাড়া আমার খুব কষ্ট হয় বাবা। তুমি কেন ছেড়ে চলে গেলে আমার?'

ট্যাক্সির পিছনের সিটে বসে আমি চোখ বুজলাম। জল এসে গিয়েছে চোখে। বারবার আসে। বড় হয়ে ওঠার পর কলকাতার আমার সেই ঘর থেকে এখন শিকাগোর এক ক্রমের স্টুডিওতে শুয়ে বাবার কথন মনে পড়বে আজও আমার চোখে জল আসে। মনে-মনে বুঁজি জীবনের কোন বাক থেকে বাবা চলে গেল ঘুরে? সারা রাত ট্রেনে দাঁড়িয়ে যে-মানুষটা আমার কাছে পৌঁছেছিল, সে কী করে আমার ছেড়ে গেল? একবারও ডাবল না। কাকুকে ছাড়া আমার শরীর খারাপ হয়। বাবাকে না দেখলে আমার বিবাহি ভাল লাগে না।

চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জল আমি রুমাল বের করে মুছে নিলাম। কিন্তু চোখ বুললাম না। আমি দার্কিলিং-এর সেই হোটেল-ঘরটা থেকে বেরোতে চাই না কিছুকণ।

টিং টিং করে পকেটের ফোনটা ডেকে উঠল এবার। এখন আবার কে ফোন করল। আমি পকেট থেকে বের করলাম ফোনটা। কাকু। ওং, ছালালে দেখছি।

'হ্যালো'।

কাকু বলল, 'কীরে, ঠিক আছে তো? মনে আছে তো? সাড়ে চারটেয় প্রিন্সেপ ঘাট?'

'মনে আছে,' আমি কথা বাড়াতে চাইলাম না।

'দেখিস, সব ভাল হবে। আমার মন বলছে।'

সত্যি। মন তো নয়, যেন জিপিটির ক্রিস্টাল বল।

আমি জানালার কাচটা নামিয়ে মাথটা সামান্য বাইরে বের করে বললাম, 'কাকু, রাত্তায় তো আমি, ভাল শুনতে পাখি না আওয়াজের জন্য। তোমায় পরে ফোন করি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' কাকু বলল, 'সাবধানে যাস।'

ফোনটা পকেটে রেখে আমি হাতখাড়ি দেখলাম। পৌনে তিনটে বাজে। সাড়ে চারটেয় মধ্যে পৌঁছতে পারব। সত্যি, কাকু এমন এক-একটা ঝামেলা পাকাচ্ছে না!

আমি কয়েকদিনের দোনেদোনে ডাবাটা কাটিয়ে ঠিক করেছিলাম আজ যাই হোক না কেন আমহাঙ্গ স্ট্রিটের ওই ট্রিকানাটায় বাবাই। লাক্সের পর সেইমতো রেডি হয়ে নিচেও নেমেছিলাম। আর তখনই কাকু শাকড়াও করেছিল আমায়।

কাকু কয়েকদিন হল অফিসে যাচ্ছে না। ছুটি নিয়েছে। না নিলে নাকি ছুটি নষ্ট হবে।

আমায় দেখে কাকু বলেছিল, 'রুকু, বেরোয়িস?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম শুধু।

কাকু বলেছিল, 'তবে আজ দেখা করে নে পূজার সঙ্গে। রমেনবাবু একটু আগে ফোন করে বললেন, পূজা তোর সঙ্গে সাড়ে চারটে নাগাদ দেখা করবে।'

'মানে? কেন?' আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, 'আরে, আগে বলবে তো। আমার কাজ আছে জরুরি।'

কাকু বলেছিল, 'খালি কাটিয়ে যাক্ষিস তুই। ওসব আমি শুনব না। আজকেই দেখা করতে হবে। আর, আমার প্রেস্টিজটার কথা একবার ভাব। ওদের সামনে তো খুব হ্যাটা করলি আমায়। আজও করবি?'

'কাকু, আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'এসব কী বলছ। হ্যাটা মানে? আমার সমস্যাটা আমি বলতে পারব না?'

'আমি কিছু জানি না। তোকে আজকেই যেতে হবে। আমার একটা কথা অন্তত রাখ। সাড়ে চারটেয় সময় প্রিন্সেপ ঘাট। মিস করবি না।'

কাকুর একরোখা ভাব দেখে আমি থমকে গিয়েছিলাম। বয়স্ক মানুষ। কী বলব। আমি বেশি ঝামেলা করতে পারি না। জীবনের বহু ক্ষেত্রেই কিছু মনে নিয়েছি ঝামেলা হওয়ার ভাবে।

বলেছিলাম, 'ঠিক আছে। দেখা করব। এখন আসি?'

কাকু বলেছিল, 'তোকে আর-একটা কথাও বলার আছে। এসব কী শুরু করেছিস তুই?'

'মানে?' আমি অবাক হয়েছিলাম।

কাকু বারান্দার একপাশ থেকে মোড়টা টেনে বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়েছিল। তারপর পাশের টেবিল থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে বলেছিল, 'তোরা কি টাকাপয়সার মায়া নেই?'

'কী ব্যাপার মায়া তো!'

'মাকে তুই ভিডি কিনে দিয়েছিস? নাইট কিনে দিয়েছিস?'

আমি থমকে গিয়েছিলাম একটু। এই হল এখানকার মানুষের সমস্যা। আমার টাকায় আমি ঠাকুমাকে কিছু কিনে দিয়েছি। কাকুর তাতে কোনওরকম ক্ষতিবিকির সম্ভাবনা নেই। তা-ও কাকু পুট করে নিজের নাটকি গলিয়ে দিল।

আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ। তাতে কী হল?'

'কী হল মানে?' কাকু জোরে সিগারেট টান দিয়ে একমুখ ঘোঁষা সিলিগের দিকে ছেড়ে বলেছিল, 'তোরা কি মাথা বারাপ? মায়ের বয়স এখন প্রায় আশি। আর কতদিন বাঁচবে? তুই এভাবে পরস্যা নষ্ট করছিস? তোর না মিন কার্ডের জন্য টাকা জমাতে হবে? সেখানে তুই বত্রিশ ইঞ্চি টিডি কিনে দিলি? ওই তো মা দেখে কতগুলো জঘন্য গান। তার জন্য ফালতু পরস্যা নষ্ট না করলেই চলছিল না।'

আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জানি কথায় কথাই বাড়বে। তাই বলেছিলাম, 'শোনো না কাকু, এসব ভেবে না। আমি ঠিক হিসেব করে করছি। ঠাকুমাকে তো কোনওদিন কিছু দিইনি।' কাকু বলেছিল, 'আমি কী বলব? যা খুশি কর। আমার কী? শুধু মনে রাখিস বিয়েটা করতেও কিন্তু টাকা লাগবে। ওটা কিন্তু বিনাপয়সায় হবে না।'

'সাব আমহাঙ্গ স্ট্রিট এ গয়া হায়,' জাইভার ছেলোটা আমার

মিকে পিছন ফিরে তাকাল।

আমি বললাম, 'তুমি সোজা চলে।' কেশব সেন স্ট্রিটের মোড় থেকে ডানদিকে নেবে, সেখান থেকে আবার ডানদিকে হেরেখ দাস লেনে নেবে।'

'জরা বতী দিখিয়ে গা। হামে ঠিক সে মালুম নেই হায়।'

'হ্যাঁ, বলে দেব।' তুমি সোজা চলে।'

রাস্তা এখন মোটামুটি ফাঁকাই। দোকানপাট খোলা থাকলেও ভিড় নেই। উত্তর কলকাতার এলোই মনে হয় রং না-করা, প্লাস্টার-খসা জমিদার বাড়ি। একসা সন্ধ্যা, বর্তমানে অবহেলিত।

তবু এইসব মিকে আসতে আমার দারুন লাগে। আগে যখন কলেজে পড়তাম, এইসব রাস্তায় একা-একা হেঁটে বেড়াতাম। পুরনো বাড়ির মিকে তাকিয়ে থাকতাম। সাবেক জানালা দিয়ে উঁকি মারা সিলিংয়ের কড়িবরগা, প্লাস্টার খসে বেরিয়ে পড়া পাতলা ইট। চুন-সুড়িকির গাঁথনি। আর্চ। কাঠের রেলিং। অরোকা। আর বারান্দায় আচমকা দেখতে পাওয়া আবহা হয়ে যাওয়া কোনও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার মুখ। এরাই যেন কলকাতার নিজস্ব কুক অ্যান্ড কেলভি ঘড়ি।

ডান দিকে সিটি কলেজ রেখে ট্যাক্সিটা আরও কিছুটা এগোনোর পর কেশব সেন স্ট্রিট পেলাম। আমি অনমানন্দ হিলাম, তাই হেলোটো কলেজ সিটি দিয়ে না ঢুকে সুকিয়া স্ট্রিট দিয়ে ঢুকে পড়ছি। ফলে একটু দূর হল।

কেশব সেন স্ট্রিটের নামটা দেখলাম রাস্তার পাশে ঝোলানো সবুজ বোর্ডে। এটা বেশ ভাল হয়েছে। আমি লক্ষ্য করছি, এখন সবুজ বা হলুদ বোর্ডে রাস্তার নাম লেখা থাকে।

বললাম, 'মোড় থেকে ডান দিকে নাও।'

কেশব সেন স্ট্রিট দিয়ে কিছুটা এগিয়েই ডান দিকে বৈকুণ্ঠেশ্বরীর আর বাঁ দিকে সহিবাবার মন্দির। আর-একটু এগিয়ে গিয়ে গুপ্তা হোটেল। তার পাশ দিয়েই হেরেখ দাস লেন ঢুকে গিয়েছে।

আমি এখানে ট্যাক্সিটা ছেড়ে গিলাম।

পকেট থেকে প্রিন্টআউটটা বের করলাম আবার। টিকানাটা এই জায়গারই। কিন্তু কী আশ্চর্য! টিকানা দিলেও কোন নম্বর দেখনি। আমারও আর ই-মেল করে সোটা ছেনে নেওয়া হয়নি।

এই রাস্তাটা বড়রাস্তার তুলনায় সরু। দু'পাশে দোকান আর পুরনো বাড়ির সারি। কিন্তু এখানে তো কোনও নম্বর লেখা নেই। সামনেই একটা স্টেশনারি দোকান। বয়স্ক একজন বসে মোবাইলে কীসব খুঁটাট করেছ। আমি এমিক-ওমিক দেখে এগিয়ে গেলাম।

লোকটা আমায় দেখে উৎসাহভরে তাকাল। খন্দেব।

আমি বললাম, 'দাদা, এই বাইশের বি-টা কোনদিকে হবে?'

'বাইশের বি।' লোকটা নিড়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে, 'ওই সামনে

গ্যাসপোস্টের পাশের বাড়িটা।'

আমি সময় নিলাম একটু। হাতে করে কিছু নিয়ে আসিনি। এটা

ঠিক নয়। আমি কিছু না নিয়ে কারও বাড়ি যাই না।

লোকটা তাকাল আমার দিকে, 'বললাম তো, ওই সামনে

গ্যাসপোস্টের...'

'ভাল চকোলেট আছে?' আমি দোকানটার ভিতরে চোখ

বোলালাম।

লোকটা উৎসাহ পেলে আবার। হাতের মোবাইলটা রেখে বলল,

'কেমন চান বলুন? একশো, দেড়শো।'

'আরও ভাল কিছু নেই?'

'দুটো দেড়শো টাকার প্যাক দিয়ে বিই?'

দোকান থেকে চকোলেট কিনে বেরোলাম। আমার তেমন পছন্দ হয়নি। কিন্তু এই তো পাওয়া গেল। আর কিছু পাওয়া যায়নি। তাই এটাই নিলাম।

কলকাতা এখনও বেশ কিছু পুরনো জলের পাইপের কন্ডার আর গ্যাসের পোস্ট টিকে আছে। এখানেও সেই প্রায় ডোডো হয়ে যাওয়া পোস্টের একটা দেখলাম।

পোস্টের প্যাসের বাড়িটা বেশ বড়। অনেক পুরনো। এককালে লাগ রঙের ছিল। কিন্তু রাস্তার দোকানের সত্তা চায়েই মতো রং হয়েছে এখন। বাড়িটা চার উলা। নিচের বড় দরজাটায় একটা লোহার গেট লাগানো থাকলেও সেটা কেমন যেন কেতড়ে আছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহুদিন নড়াচড়া হয়নি।

আমি জানি, দোস্তলার উঠতে হবে।

ইট বের করা সিঁড়ি। নড়বড়ে। ঢালাই ফেটে লোহার রড দেখা

যাচ্ছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোস্তলার লম্বা বারান্দা। তার পাশে সার-সার ঘর। প্রতিটা ঘরের মাথায় আবহা হয়ে আসা নম্বর। আমি চার নম্বরটা খুঁজলাম। ওই পেন্সের দিকে।

বুকের ভিতরে একটা ব্যান্ড পার্টি চলছে যেন। বিউগল, ড্রাম নিয়ে লম্বা একটা লাইন প্রচণ্ড আওয়াজ করতে-করতে এগিয়ে আসছে। আমি চোয়াল শক্ত করলাম। তারপর এগিয়ে গেলাম দরজাটার দিকে।

তাল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম একদম। যাঃ।

দরজা বন্ধ। আমি ভালটা ধরলাম। পুরু ধুলো। বোঝা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন হাত পড়েনি এতে। আমি হাতে ধরা চকোলেটের প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম হতভম্ব হয়ে। এবার? এবার কী করব?

পাশ থেকে খুঁট করে তিন নম্বরের দরজাটা খুলে গেল। একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন। বছর চল্লিশেক বছর। ফরসা।

'কাকে চাইছেন আপনি?' মহিলা সময় নিয়ে ভাল করে মাপলেন আমায়।

'এখানে যারা থাকতেন...'

'নেই। মহিলাটি আমায় কথা শেষ করতে দিলেন না, 'চলে গিয়েছে সোনারপুর।'

'টিকানা আছে? ফোন নম্বর?'

'ফোন নম্বর আছে, তবে সেটা কাজ করছে না। বোধ হয় সিম চেক করে ফেলেছে। তবে টিকানাটা আছে।'

'মেবের?' আমি তাকালাম মহিলার দিকে।

'সাঁদান,' মহিলাটি ভিতরে চলে গেল।

অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আমার। আমি ভাল করে চারপাশটা দেখলাম। ভাড়া বাড়ি। পুরনো দিনের। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অবস্থা ভাল নয়।

মহিলাটি ফিরে এলেন মিনিট দুয়েক পরেই। হাতে একটা কাগজ। তাতে পেনসিলে লেখা টিকানা। আমি কাগজটা নিলাম।

মহিলাটি বলল, 'মাস পাঁচেক আগে চলে গিয়েছে। আর আসবে না।'

আমি শুধু ধন্যবাদ নিলাম। আর কিছু বললাম না। কলেজে থাকতে যেখানে গিয়েছিলাম, সেটা শোভাবাজারে একটা গলির ভিতরের বাড়ি ছিল। সেখান থেকেই কি এখানে এসেছিল বাবা?

আমি টিকানাটা পকেটে ঢুকিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। ভাল লাগছে না। নিচ্ছেকে অনেক কষ্টে তৈরি করেছিলাম এই দিনটার জন্য। কিন্তু সবই কেমন যেন জ্বল জ্বল ঢেলে মিল ডগান।

'আপনি কে হন?' মহিলাটি হঠাৎ গলা তুলে জিজ্ঞেস করল।

আমি সিঁড়ির মুখ থেকে ক্রান্ত গলায় বললাম, 'পরিচিত।'

প্রিশেপ বাটো বেশ সাজানো হয়েছে। জেমস প্রিশেপের সৌধটাও ঠিক করা হয়েছে। বেশ ফুটফুটে রং ঝলসছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে ভালই লাগল জায়গাটা।

এখন সাড়ে চারটে বাজে। আমি বড়রাস্তা থেকে গঙ্গার দিকে এগোলাম। চারদিকে মানুষের মেলা। হকাররা খাবার নিয়ে ঘুরছে।

মাঠে বাজারা সৌন্দর্যে। অল্পবয়সীরা বসে আড্ডা দিচ্ছে। প্রেম করছে।

টিং টিং করে ফোনটা বাজল আবার।

'হ্যালো।'

‘আপনি কোথায়? আমি কিন্তু এসে গিয়েছি,’ ওপাশে একটা মেয়ের গলা। পূজা।

আমি মেয়েটার নম্র নিতে চাইনি। কিন্তু মেয়েটা আমার নম্র পেয়েছে। এ নির্যাত কাকুর কাণ্ড। অবশ্য ঠিকই করেছে। না হলে চিনবই বা কী করে?

পূজা বলল, ‘তুমি কি ঝাই কালারের টি-শার্ট পরে আছ? হাতে কি ব্রাউন প্যাকেট? চোখে চশমা?’

‘হ্যাঁ, তুমি কোনে দেখতে পাও নাকি?’ দেখলাম, দ্বিতীয় সেনেটোলই পূজা ‘তুমি’-তে নেমে এসেছে।

পূজা হাসল, ‘তোমায় দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়াও, আমি আসছি।’ ফোনটা কেটে আমি চারদিকে তাকালাম। আমায় চেনে? চিনতেই পারে অবশ্য। কাকু কি আর আমার ছবি ওদের না দিয়ে বসে থেকেছে এতদিন?

‘হাই, আমি পূজা!’ জিন্স আর ডেনিমের জ্যাকেট পরে একটা মেয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে।

‘হাই,’ আমি হোট করে বললাম।

পূজা হাসল। মেয়েটা বেশ লম্বা। শ্যামলা গায়ের রং। চুলটা ছোট করে কাটা। মুখটায় এখনও ছেলেমানুষি তার!

পূজা বলল, ‘তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?’
আমি হাসলাম, ‘এটা তো শিকাগোর সামারের টেম্পারেচার।’
‘তাই?’ পূজা বলল, ‘লেটস সিট সামহোয়ার। জলের ধারে চলা।’

আমরা এগোলাম। একটা লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গঙ্গার পাড়ের দিকে চলে গিয়েছে রাস্তাটা। দেখলাম, গঙ্গার পাড় বরাবর একটা টাইলস বাঁধানো রাস্তাও আছে। ফুটপাথের মতো। পাশে-পাশে বেঞ্চ রাখা।

চারটে বেঞ্চ পরে একটা খালি জায়গা পেলাম আমরা।
পূজা বসে তাকাল গঙ্গার দিকে। বলল, ‘আমার নদী খুব ভাল লাগে। সমুদ্রও। তোমার কী ভাল লাগে?’

আমি বললাম, ‘সেভাবে তো ডাবিনি কোনওদিন।’
পূজা জিজ্ঞেস করল, ‘শিকাগোর কী আছে?’
‘পাহাড় যা সমুদ্র কিন্তু নেই। তবে মিশিগান লেক আছে। আমি ওর ধারে সকালে সৌঁড়ে যাই। এমনতে শিকাগো খুব ঠাণ্ডা। তবে ওই লেকটা না থাকলে আরও ভ্রাই হত!’

‘কেমন ঠাণ্ডা পড়ে? মাইনাসে নামে টেম্পারেচার?’
আমি হাসলাম, ‘মাইনাসেই থাকে অনেক সময়। তুষার ঝড় হয়। মাইনাস কুড়ি পর্যন্ত নেমে যায় মাঝে-মাঝে। হরিবল!’

‘এক্সাইটিং তো!’ পূজা ঘুরে বসল।

‘অভুটা নয়। তেমন-তেমন ঝড় হলে পাওয়ার ফেল করে। দু’-তিন দিন পাওয়ার থাকে না। রুম হিটার চলে না। ঠাণ্ডায় মারা পড়ার মতো অবস্থা হয়!’

‘তোমার ফায়ার স্টেস নেই?’
আমি হাসলাম, ‘সবাই তো হলিউডের দেখানো ছবির মতো বাড়িতে থাকে না!’

পূজা মাথা নাড়ল। বলল, ‘তুমি বিরক্ত হচ্ছে আমি এইসব জিজ্ঞেস করছি বলে?’

‘না,’ আমি হাসলাম।

সত্যি আমার বিরক্ত লাগছে না। মেয়েটা আমার চেয়ে বয়সে অনেকটা ছোট। উদ্ভাস বেশি। এমনটাই তো থাকা উচিত। জীবন এখনও স্যাড পেপার হাতে নিয়ে ওর মধ্যে ঢুক পড়িনি।

পূজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল একটু সময়। তারপর হঠাৎ বলল, ‘বা বলেছে তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজি নও। কিন্তু আমাকে নাকি যেভাবেই ছোকে তোমায় কনভিন্স করতে হবে। এই পৌষ কেটে গেলেই মাঘে বিয়ে দিয়ে দেবে।’

আমি থমকে গেলাম। মেয়েটা এসব কী বলছে!

পূজা বলল, ‘কেন কনভিন্স করতে হবে? আমার ঠাণ্ডা মোটেও ভাল লাগে না। বিদেশ যেতেও ইচ্ছে করে না। ফুচকা পাওয়া যায় না। কাকুর লোক নেই। আচ্ছা মারা যায় না। গাড়িহাটের মতো জায়গায় ঘুরে-ঘুরে দরদাম করে জিনিস কেনা যায় না। দুর্গা পূজোয় ডিডের ভিতর ঠাকুর দেখা যায় না। রাস্তায় সস্তায় বিরিয়ানি ঝাওয়া যায় না! দুঃ, আমার ভাল লাগে না একদম।’

আমি কিছু না বলে হেসে তাকালাম ওর দিকে।

পূজা বলল, ‘প্লাস আমার বয়স্কেন্ড আছে। সৌগত। যাদবপুরে পড়ে। ফিজিক্স। আরামবাগে বাড়ি। ভাল ছেলে।’

আমি মজা করে বললাম, ‘কিন্তু তোমাকে যদি আমার পছন্দ হয়ে যায়, তবে?’

পূজা বলল, ‘মিক্স মিক্স, পছন্দ করো না। প্লাস, আমি জানি।’

‘কী জানি?’ আমি অবাক হলাম।

‘তোমারও একটা লাভ স্টোরি আছে।’

‘আমার?’ আমি হাসলাম, ‘সে তো সবার একটা করে থাকে।

ছোট-বড় যেমনই হোক, একটা থাকেই।’

‘না, তোমারটা তেমন নয়। অন্যরকম।’ পূজা মাথা নাড়ল।

‘মানে?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পূজা সময় নিল একটু। জলের দিকে তাকাল। কয়েকটা নৌকা ঘুরছে। তাতে জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়েরা বসে। আলো কমে এসেছে বেশ।

পূজা বলল, ‘তোমায় নিশ্চয় কোনও মেয়ে খুব কষ্ট দিয়েছে, না?’
কেউ যেন আচমকা থান্ডা দিল আমায়। আমি মুখটা সরিয়ে বিন্যাসাগর সেতুর দিকে তাকালাম। মনে ভেসে উঠল, একটা সকাল।
কদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো একটা মেয়ে...

‘কী কী?’ পূজা জিজ্ঞেস করল আবার।

আমি কথটা এড়াতে বললাম, ‘বিশেষ কিন্তু এমন কৌতূহল কেউ দেখায় না।’

পূজা বলল, ‘সেইজনাই তো ওপসে যাব না। বাজে লোকজন।
রোবট সব। বোলা না, সত্যি কি না, যা বললাম?’

আমি হাসলাম, ‘এমন ভাবার কারণ?’

পূজা বলল, ‘আমি জানি। না হলে কেউ দশ বছর দেশে ফেরে না? কার উপর রাগ তোমার? সে এখন কোথায় রুকুনা? তুমি কি এখনও মনে-মনে তাকে ভালবাসো?’

॥ ও ॥

‘আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার তোমাকে, আমার তোমাকে খুব পছন্দ,’ অসুটে কথটা বলে সামনের দিকে তাকালাম আমি। আবছা অন্ধকারে আয়নার নিজেই মুখটাই ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তা-ও আমি তাকিয়ে রইলাম।

বাসে খুব ভিড় আজ। তার ওপর সামনের দিকে আলোটা কাঙ্ক করছে না। আমি জাইভারের পিছনের লেডিস সিটের গায়ে একদম টিডোচাপটা হয়ে আছি। মনটাও যাচ্ছে আঁহে খুব। ফালতু কারণে জিনিতার সঙ্গে ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। তাই আজ গ্যাডি নেই আমার কপালে। ভিড় বাসের থান্ডা ঝাওয়া আছে। আর যত থান্ডা বাড়ি ততই জেনটা চেপে যাচ্ছে আমার। মনে পড়ছে জিনিতার কথাগুলো, ‘সাহস আছে তোরা? সংসাহস আছে? পছন্দ! হাঁ, বলে দেখা তবো। হাতের লস্ট্রী পায়ে টেলকিস তো।’ বলে দেখ, ছুতো খাবি।’

জাইভারের সিটের পিছনে যে পাটিশান, তার এদিকে বড় একটা আয়না লাগানো আছে। তার সামনে লেডিস সিট। সেখানে একজন বৃদ্ধ মহিলা বসে রয়েছেন। আমার তার ওপর প্রায় চেপটে দিয়েছে পিছনের ভিড়। আমি কোনওমতে সেই ভিড়ের থান্ডা সামলে, বয়স্ক মহিলাকে এড়িয়ে সামনের আয়নার উপর হাতের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।



মনের মধ্যে এমন পিণ্ডারমিটের তুফারপাত হতে পারে, আমি এই প্রথম জানলাম।

আমি আবার আয়নায় নিজের দিকে তাকালাম। ভূতো খার।
আমার সাহস নেই? আচ্ছা, দেখা যাবে।

আজ কলেজের পরে আমরা গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিট। জিনিতার
বাবার জন্মদিনের পাটিটা ওখানেই দেওয়া হয়েছে।

কোনওদিন খুব একটা বড় রেষারেষি যাওয়া হয়নি আমার। আসলে
খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে আমি। আর বড় হতে-হতেই
দেখেছি বাবা আর মা নিজেদের পারস্পরিক সমস্যা নিয়েই সারা
জীবন ব্যস্ত থেকেছে। আমার জন্য তাদের সময় ছিল না বিশেষ। ফলে
তেমনভাবে আমি কোনওদিন বাইরে ঘুরতে বা খেতে যাইনি। আর
সেই থেকেই এইসব জায়গায় যেতে আমার সন্ধ্যা হয়।

কিন্তু জিনিতা আমার খুব ভাল বন্ধু, তাই ওকে আর এড়াতে
পারিনি। তবে শুধু গেলেই তো হয় না। একটা উপহারও কিনতে হবে।
আমি জানি জিনিতারদের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। তাই ওর বাবাকে
তো আর যেমন-তেনম জিনিস দেওয়া যায় না।

আমি খুব মাথা খাটিয়ে একটা টাই কিনেছিলাম উপহার হিসেবে।
ভেবেছিলাম, শতিনেক টাকার মধ্যে কিছু দেব। কিন্তু টাই কিনতে
গিয়ে সাড়ে ছ'শো টাকা বেরিয়ে গিয়েছে পকেট থেকে। তা-ও সেটা
নাকি দোকানে যেসব টাই আছে, সেই হিসেবে নিচের দিকের
কোয়ালিটির জিনিস। আমায় তো প্রথমে আড়াই হাজার টাকার টাই
সেখাচ্ছিল। আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আমার এই জামাকাপড়,
পায়ে পুরনো কুয়া ড্যাডিস, আর পায়ের ঝোলা দেবেও দোকানদার
ছেলেটি বাথেনি আমার পকেট জিন্মে যায় না।

কলেজ থেকে আমি জিনিতার গাড়িতেই গিয়েছিলাম পার্ক স্ট্রিট।
যদিও আমি প্রথমে ওর সঙ্গে যেতে চাইনি। কিন্তু জিনিতা ছাড়েনি।
বলেছিল, 'না, তোকে আমার সঙ্গেই যেতে হবে। তোর যা মতিগতি

আজ্ঞাকাল, তুই না-ও যেতে পারিস।'

'মতিগতি মানে?' আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

জিনিতা বলেছিল, 'অত মানে বুঝতে হবে না তোকে। আমার
সঙ্গে যাবি বলেছি, যাবি। বাস।'

আজ কলেজে একটা পরীক্ষা ছিল। তাই জিনিতা বাধ্য হয়েই
এসেছিল ক্লাসে। ওর বাবা-মা আর আত্মীয়স্বজনরা সাড়ে পাঁচটার
মধ্যে পৌঁছে যাবে। আর কলেজ শেষ করে আমরা যাব।

আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আর কাউকে নেমস্তম্ব করেনি
জিনিতা। এই কথাটা জেনে আমার অস্বস্তি যেন আরও বেড়ে
গিয়েছিল। তাই থেকে-থেকেই পেরেকের কথাটা উকি মারছিল মনে।
জিনিতা কি সত্যি কিছু ভেবে নিচ্ছে মনে-মনে?

পার্ক স্ট্রিটের রেষারেষি খুব বড়। মোড়ের দিক থেকে বা দিকে বাক
নিয়ে একটুখানি এগিয়ে জিনিতার গাড়িটা একটা বড় কাচের দরজার
সামনে নাড়িয়েছিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে দেখেছিলাম, রেষারেষি
সামনেটাও লেস, বেলুন আর ড্যান্ডলারে বেশ ঝলমল করছে। আর
তার মধ্যে একটা ছোট বোর্ডে ঝোলানো, হ্যাপি বার্থ ডে।

হাসি পেয়ে গিয়েছিল আমার। এই দু'হাজার চার সালে একজন
শ্রৌট মানুষের জন্মদিনের জন্য এত টাকা খরচ করছে এরা। টাকা কি
কামড়ায় এদের।

আমি এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ, মনে-মনে যতই হাসি
থাকুক না কেন যেসব মানুষজন ঢুকছে, তাদের পোশাকআসাক দেখে
রীতিমতো কমপ্লেক্স খেয়ে গিয়েছিলাম।

আমি একটা শার্ট আর জিন্স পরে এসেছি। পায়ে ছ'বার সেলাই
করা জুতো। সেখানে লোকজন যা পরে এসেছিল, তাতে আমার চোখ
কপাল ছাড়িয়ে উঠে গিয়েছিল ব্রহ্মতালুতে। নিজেদের কেদার মতো

লাগছিল। ভাবছিলাম, আমার এই রঙের নীল রঙের খোলাটা সঙ্গে না আনলেই পারতাম।

জিনিভা বলেছিল, 'কী রে, এমন করে দাড়িয়ে আছিস কেন? চল ভিতরে।'

আমি নিজেই খোলাটার দিকে তাকিয়েছিলাম। এটা নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?

জিনিভা বুকেছিল ব্যাপারটা। হেসে বলেছিল, 'তুই এটা নিয়ে তাবছিস? সত্যি? চলা।'

স্বর্ণ কোথায়? কাচের ভারী পাল্লার ওপারে? আমার তো ভাই মনে হয়েছিল।

সেস্তারটা বিশাল বড়। খুব সুন্দর করে সাজানো। বড় হলের একদিকে একটা স্টেজ করা হয়েছিল। সেখানে জিনিভার বাবা আর মা দাঁড়িয়েছিলেন। দেখে মনে হচ্ছিল নতুন বিয়ে হয়েছে ওদের।

আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না। কুছমেলায় হারিয়ে যাওয়া বাছুর মতো লাগছিল নিজেকে। এত রঙের মানুষের ভিতরে নিজেকে চরিত্রের দশকরে ঘবা প্রিন্টের বাংলা সিনেমা মনে হচ্ছিল। আসলে আলোর পাশে দাঁড়ালেই সব সময় অন্ধকার যায় না।

জিনিভা এসে টান মেরেছিল আমায়, 'কী রে? কী হয়েছে আজ তোর? এমন গুটিয়ে আছিস কেন? এখানে এত লোক দেখে বাবড় গেলি নাকি? শোন, যারা এসেছে না, তারা সবাই খালি কলসি কিন্তু। মেজআপ আর হাবডাব দিয়ে খ্যালোসেনসকে ঢাকতে চাইছে। তুই তো বাবা, মা, ভাই সবাইকে চিনিস। তবে এমন করে এক পাশে দাড়িয়ে আছিস কেন? আয় আমার সঙ্গে।'

আমি ভিড়ের ভিতরে যতটা পারা যায় অদৃশ্য হয়ে জিনিভার পিছন-পিছন গিয়েছিলাম।

জিনিভার বাবা আমায় দেখে 'আরে তুমি।' বলে সবার সামনে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

আমি আরও কঁকড়ে গিয়েছিলাম। তারপর উনি আমায় ছাড়লে ঝিয়ার সঙ্গে খোলা থেকে বের করে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম টাইয়ের প্যাকেটটা।

জিনিভার মা সবার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'এর নাম ক'রছিল। খুব ভাল ছেলে। এইচএসএ টুয়েলভত হয়েছিল। জিনিভার সঙ্গেই পাড়ে। আমাদের ঘরের ছেলে বলতে পারো। বিদেশ যাবে খুব শিগগির। দারুন প্রসপেক্ট ওর। কিন্তু কী সিম্পল, দেখেছ।'

জিনিভার মায়ের কথা শুনে আমার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ানো মানুষজনের মধ্যে কেমন যেন একটা মুখ চাওয়া-চাওয়ের টেউ উঠেছিল।

একজন ভীষণ সঙ্গে থাকা বৃদ্ধা সামনে এগিয়ে এসে আমার গাল ঘরে নাড়িয়ে বলেছিলেন, 'ও, এর কথাই বলছিলে তোমরা। তা ছেলে হিসেবে তো ভাই। জিনিভার সঙ্গে খুব খানাবে।' আমার পিছন।

আমি অন্ধক হয়ে সেখিছিলাম কথাটা শুনে। জিনিভা কেমন যেন লজ্জায় গোলাপি হয়ে উঠেছিল।

জিনিভার মা বলেছিলেন, 'খুব লাভুক ছেলে। আর খুব সিম্পল। এখনকার দিনে এমন ছেলে পাওয়া মুশকিল।'

আমার কান-মাথা সব ঝাঁঝ করছিল। এসব কী হচ্ছে। আমিই জানি না, আর আমার সবকিছু এসব কী গল্প বুনছেন এরা। আমি সেখিছিলাম, সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মুখে হাসি। চোখে কৌতূহল। আমি যেন চিড়িয়াখানার জন্তু। আমার রাগ হচ্ছিল। জিনিভা এসব কী ভাবছে। ওর বাড়ির লোকজনই বা কী ভাবছে। আমার মাটেও জিনিভাকে পছন্দ নয়। ফরসা, দেখতে সুন্দর হলেই কি তাকে পছন্দ হতে হবে নাকি?

আমি সরে এসেছিলাম ঘরের এক দিকে। সামনে দিয়ে সুন্দর পোশাক পরা একজন ওয়েটার ট্রে-ওত করে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল চিকেন কাবার, ফিশ ফিসার, পনির পকোড়ার মতো খাবার।

সারাদিন বিশেষ কিছু বাইনি। কিন্তু তা-ও আমার খিদে পাচ্ছিল

না। বরং গা শুশোখিল হঠাৎ। চারদিকে এত আলো। এত সুগন্ধীর সংমিশ্রণ সব কেমন যেন ভালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল চারদিক থেকে চারটে দেওয়াল বোথ হয় আমার পিছে দেবে। আমি কোনওমতে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিলাম।

'এই যে, এখানে বসে কী করছ?'

আমি মুখ তুলে সেখিছিলাম, জিনিভার ভাই জনি এসে দাড়িয়েছে সামনে।

ছেলোটা খুব পাকা। ইলেভেনে পড়ে একটা খুব নামকরা ইংলিশ মিডিয়ামে। আমি দেখলাম, ওর সঙ্গে কয়েকটা বিশেষি ছেলেও আছে। মনে পড়ল জনিদের খুলে বিদেশিও পাড়ে।

আমি বললাম, 'মাথাটা ধরছে একটু ভাই...'

'ডোউ বি শাই ক্লুদা। বি শাট। চলা, লেটস হ্যাভ সাম ফান আউট সোয়ার। তুমি জিভ নাওনি। ককটেল ডিনার কিভ এটা।'

আমি চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। পুতনির কাছে ছাপিয়ে মতো দাড়ি রেখেছে ছেলোটা। গোফ কামানো। চুলগুলো লম্বা। কোন বেশি ষ্টাইল কে জানে।

আমি বললাম, 'ইউ এনজয়। আয়াম ওকে।'

'ডোউ বি আ স্পয়েলস্পোর্ট। চলা না।'

'জনি, ওকে ডিসট্রাক্ট করছিস কেন? যা তোরা,' জিনিভা এগিয়ে এসে ধমক দিয়েছিল এবার।

জনি ওর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল। তারপর চলে যেতে-যেতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওকে। টেক ইওর সুইট টাইম জামাইবাবু।'

আমি আর নিতে পারিনি। চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে জিনিভার দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, 'এটা কী হচ্ছে বল তো? জামাইবাবু! ভাল ছেলে। সস্তাদের পছন্দ। এসব কী ব্যাপার?'

জিনিভা তাকিয়ে হেসেছিল সামান্য। তারপর আমার হাতটা ধরে ঝাড়তে টানে পাশের একটা দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হলঘরের লাগোয়া ছোট ব্যালকনিতে।

বারান্দাটা ফাঁকা। কেউ নেই। এখানে জিনিভা কেন নিয়ে এল আমায়? আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করছিল। মুখটা ভেতো লাগছিল। কী বলতে আমায় এখানে নিয়ে এল জিনিভা? আমাকে কী বলে প্রতিহত করতে হবে ওকে?

'রিজেকশন' শোনার চেয়ে অন্যকে 'রিজেক্ট' করা আমার পক্ষে অনেক বেশি কঠিন আর কষ্টের। আমি কখনও গভগোলা চাই না। চাই না কাউকে মতোওরকম কষ্ট দিও। এখন পৃথিবীতে অন্যের মুখ জান করে দেওয়াটাই হয়তো শার্টনেস। কিন্তু আমার মধ্যে সেই শার্ট ছেলোটা নেই। কোনওনি ছিলও না। সব সময়, যে-কোনও মূল্যে আমি শান্তি চেয়েছি জীবনে। তাই বাবা-মায়ের ব্যাপারেও যতটা পারি আমি আলোচনা করা করার চেটায় থাকি। ওটা আমার বেশিক নেচার। সেখান থেকে কি আমায় আজ অন্য কিছু করতে হবে। জিনিভাকে কি কঠিন কিছু বলতে হবে? কিন্তু ব্যাপারটা যেদিকে বাঁক নিচ্ছে, তাতে সত্যি কথাটা স্পষ্ট করে বলে দেওয়াই তো উচিত। তব্বতা করতে গিয়ে কামেলা জিইয়ে রাখার মানে হয় না। আমি নিজেকে মনে-মনে প্রস্তুত করেছিলাম।

জিনিভা এসে দাড়িয়েছিল আমার খুব কাছে। ওর গায়ের থেকে ঝাঁজলো পারফিউমের গন্ধ বেরিয়েছিল। আমি ভাল করে দেখে বুকেছিলাম এখানে আসার পর ও হালকা করে সেজে নিবেছে। আমি আশে ভরে পিছিয়ে গিয়েছিলাম দু'পা।

জিনিভা বলেছিল, 'বল, কী বলছিলি?'

আমি বলেছিলাম, 'এসব কী বলছেন তোর বাবা-মা? তোর ভাই, তোদের আত্মীয়রাই বা এসব কী বলছেন?'

জিনিভা আলতো করে নাড়িয়ে নিয়েছিল মুখটা। ছোট রুমাল বের করে নাকের পাশের ঘাম চেপে চেপে মুছেছিল। তারপর নরম গলায় বলেছিল, 'তুই হাঁদা একটা।'

‘আমি মোটেই হাল্কা নই,’ আমার বিরক্ত লেগেছিল, ‘এসব করিস না তোরা। আমি ভদ্রতা দেখিয়ে টুপ করে থাকি মানে কিন্তু এই নয় যে, সবটা মেনে নেব। আমায় এখানে কেন নেমস্তম্ভ করেছিস?’

জিনিভা আমার গলার স্বর শুনে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। বলেছিল, ‘তোরা কী হয়েছে রুকু? এতদিন তোকে আমি চিনি, কিন্তু কোনওদিন তো তুই এমন করিসনি আমার সঙ্গে। আজ এমন করছিস কেন? তুই পছন্দ করিস না আমায়?’

‘এরা যেভাবে বলছেন সেভাবে করি না,’ আমি চোয়াল শক্ত করেছিলাম, ‘আমার জীবনে এসব নেই। প্রাস তুই আমার বন্ধু। আমার কাছে বন্ধুর কোনও ভেদভাব হয় না। তোরা এসব কী করেছিস। আমি জামাইবাণী।’

জিনিভা আচমকা শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দাঁত চেপে বলেছিল, ‘তোরা জীবনে এসব নেই মানে? মানে, আমি নেই না...’

আমি বলেছিলাম, ‘না, তুই নেই। আমার বলতে বুঝে রাখাও লাগছে। কিন্তু শোন জিনিভা, ব্যাপারটা বোঝ। আমার অন্য একটা মেয়েকে পছন্দ।’

‘তোশানা?’ জিনিভা সটান চোখে চোখ রেখেছিল আমার।

‘এই যে আপনি গিয়ে পড়ছেন কেন?’ পাশ থেকে একটা খ্যানখ্যানে গলা এসে আমার কানে ফুটল।

বাসটা আচমকা ব্রেক কষায় আমি হুমড়ি খেয়ে পড়েছি সামনে। আসলে, পিছন থেকে তো একটা চাপ ছিলই, তাই আচমকা বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ায় সেই চাপটাই বেড়ে গিয়েছিল বুঝে।

আমি অবস্থা আলোয় দেখলাম, একজন মাঝবয়সি মহিলা। খুব বিরক্ত নিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

আমি বললাম, ‘সরি মাসিমা, এত ভিড়। প্রাস পিছন থেকে এমন চাপ এল।’

‘কে মাসিমা?’ ভদ্রমহিলা রেগে গেলেন, ‘সোজা হয়ে দাঁড়াও। আর-একবার এমন হলে পুলিশে কমপ্লেন করব।’

পুলিশ। আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম সকালে। দেবলাম, ভদ্রমহিলা তখনও বিড়বিড় করে যাচ্ছেন।

আমি যথাসম্ভব সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। তার মধ্যেও শুনলাম ভদ্রমহিলা নিচ্ছের মনে বললেন, ‘অসভ্য।’

আজ এই নিয়ে বিতীয়বার কথাটা শুনলাম আমি। প্রথমবার বলেছিল জিনিভা।

সেই ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে জিনিভা বলেছিল, ‘কী রে বলছিস না কেন? তোর তোশানাকে পছন্দ?’

আমি ওর চোখ থেকে সরিয়ে নিয়েছিলাম চোখ। বারান্দায় রাখা পাভাবাহার গাছেই একটা পাভা ধরে বলেছিলাম, ‘হ্যাঁ, মানে...ওকেই...’

‘অসভ্য। তুই একটা অসভ্য ছেলে।’

‘মানে?’ আমার মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল এবার।

জিনিভা বলেছিল, ‘সারা জীবন ধরে আমার কাছ থেকে সুবিধে নিয়ে এখন তোশানা। এতটা স্বার্থপর তুই?’

আমি চোয়াল শক্ত করে বলেছিলাম, ‘শোন, আমার জীবনটা দাতব্য করার জন্য নয়। আমি কোনও এনজিও খুলে বসিনি। এতে স্বার্থপরতার কী দেখলি? তোকে আমি আচ্ছ করে দিই না? পড়ায় ছেল্লা করি না? বন্ধু তো বন্ধুর জন্য করবই। সেটা নিয়ে এসব কী বলছিস তুই?’

জিনিভা বলেছিল, ‘আজ থেকে তুই আমার বন্ধু নোস। তুই ন্যাকা, না? কেন একটা মেয়ে তোর জন্য এমন করে বৃথিসনি? সুবিধে নেওগায়ে বোলা...’

‘যেখই বলেছিস,’ আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বলেছিলাম, ‘আমার তোশানাকে পছন্দ। এতে পৃথিবীর কারও কোনও কথা আমি শুনব না।

আমি আমার মনের কাছে ক্রিয়ার।’

‘ক্রিয়ার?’ জিনিভা ব্যঙ্গ করে হেসেছিল, ‘আমি নিজে থেকে বললাম বলে আমার এমন করতে পারলি তো। ওকে বলার সাহস আছে তোর?’

‘হ্যাঁ আছে,’ আমি বলেছিলাম।

জিনিভা বলেছিল, ‘আনিস কি ওর পিছনে কত বড় লাইন। পেরেক বলেছে আমায়। শি ইল্লা লাইক দ্যাট ওনলি। ছেলেদের ঘোরাতে ওজা। শোন, ও কখনও কারও কাছে কমিট করবে না, এটা জেনে রেখে দিস। ও শুধু চায় ওকে দেখে ছেলেরা নাচবে। ইউ পিপল আর সো ফুল অব শিট। সো মার্কি-ব্রেনড। নাচাচ্ছে নাচছিস!’

‘পেরেক বলেছে?’ আমি রাগের গলায় বলেছিলাম, ‘পেরেক সবার নামেই বাজে কথা বলে। ওর কথার গুরুত্ব নেই আমার কাছে। তোশানা মোটেই এমন নয়। ওকে আমি আমার ফিলিং বলব। ইউ উইল সি দ্যাট।’

জিনিভা বলেছিল, ‘সাহস আছে তোর। সং সাহস আছে। পছন্দ। হাঁ। বলে দেখা তবে। হাতের লস্কী পায়ে ঠেলেছিস তো। বলে দেখ, জুতো খাবি।’

আমি কেটে-কেটে বলেছিলাম, ‘আমার নিচ্ছের ভিতরে তোশানাকে নিয়ে একটা কনফিউশন ছিল। তবে আজ তুই সেটা ক্রিয়ার করে দিলি জিনিভা। তোকে ধ্যাক্স।’

জিনিভা হিসহিসে গলায় বলেছিল, ‘বেরিয়ে যা এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবি না। নেমকহারাম।’

টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের কাছে বাস থেকে নামলাম। এখন রাস্তায় নতুন হলুদ আলো লেগেছে। সব কিছু যেন হলুদ সেলোফেনে মোড়া।

বাসস্টপের পাশেই একটা বড় রোলের দোকান। চারিদিকে ডিম ভাঙার গন্ধ ম ম করছে। আমার গা পাক দিয়ে উঠল আবার। মাথাটাও ঝুলে যেন। বমি করতে পারলে ভাল লাগত।

আমি রাস্তা পার করে পাড়ার দিকে এগোলাম। তবে বাড়ি যাব না আমি। তোশানার বাড়ি যাব এখন। আমার সংসাহস আছে কি না দেখাখি।

বেশ কয়েকদিন হল তোশানার সঙ্গে দেখা নেই আমার। মানে, ওকে সেই কলেজ স্ট্রিটে শেষ দেখেছিলাম। তারপর কোনও পাভাই নেই। আমি সুস্কুল বুক ওকে মেসেজ করেছিলাম একবার। কিন্তু কোনও রিপ্লাই পাইনি।

তারপর থেকে যত দিন কেটেছে আমার কষ্ট বেড়েছে। কিন্তু তা-ও ওকে কিছু বলার আগে আমার মাথায় হাজার হাজার প্রশ্ন কাটাকুটি খেলেছে। ওর বচন প্রায় আমার সমান। ওদের বাড়ি খুব রক্ষণশীল।

আর তার ওপর আমার বাড়ির অবস্থা। পাড়ার প্রায় সবাই জানে আমারেই সবচেয়ে মা যখন চিৎকার করে, গালাগাতি করে, সারা পাড়ায় শোনা যায়। রাস্তায় বেরোতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায় একমুহ। এমনভেই তোশানার মা আমায় পছন্দ করে না বলেই শুনেছি। সেখানে যদি এসব শোনে, তবে তো আর রক্ষে নেই।

কিন্তু যতই এইসব প্রতিবন্ধকতা আমি মনে-মনে দেখেছি, ততই যেন আমার সুস্কুল ভিতর চাঁপের বৃদ্ধি যেন চরকা কেটেছে। আর তার তুলে ভুবারপাতের মতো ঢেকে ফেলেছে আমায়। আমি বুঝতে পারিছি আমার মন একটা চরম পরিণতির দিকে এগোচ্ছে।

কোনও মেয়েকে প্রপোজ করা কঠিন কাজ নয়। আসলে কঠিন ব্যাপারটা হল তার পরের অংশটা। সে যদি ‘না’ করে দেয় সেটা সামলানো।

আজ যদি আমায় ‘না’ করে দেয়। তবে?

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। পেরেক বলেছে তোশানার পিছনে লাইন আছে। এটা যদি সত্যি হয়, তা হলে আমার পেরি করা ঠিক হবে না। প্র্যান করে জীবনে কোনও কাজ করতে পারিনি। আমি ওয়ার্ল্ডসওয়ার্ডের স্পনটেনিটিটে বিবাসী। আর আজ আমি খুব

শ্পনটেনিয়াস হয়ে আছি।

পাড়ার ছোট গলিতে এমনিতেই আলো নেই। তার ওপর আজ যেন বেশি অন্ধকার লাগছে সব কিছু। আমার মনের প্রোজেকশন কি? আমি দেখলাম শুধু অন্ধকারই নয়, গলিটা আজ বেশ নির্জনও।

এটা দিয়ে গেলে তোশানাদের বাড়িটা কাছে পড়ে। আমি মনে-মনে বুকের ভিতরের সাহসের ধলিটাকে ফোলানোর চেষ্টা করলাম। তোশানা যদি দরজা না খোলে। যদি ওর মা দরজা খুলে বের হন, তবে? আমি কি একটা ফোন করে ওকে বাইরে ডাকব। যদি ও ফোন না তোলে। যদি...যাডতেরি। বুকের সাহসের ধলিতে কি লিক আছে? কিছুতেই যাটা ফুলছে না কেন? তোশানার ময়ের মুখটা কি আলপিশ?

আমি রুত পা চালালাম।

গলির মাঝামাঝি এসে আচমকা কী যেন মনে হল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর পিছন ঘুরেই আটকে গেলাম মাটিতে। আবছা একটা মানুষের অবয়ব। এগিয়ে আসছে। আবছা হলেও চিনতে অসুবিধে হল না আমার। এইভাবে হাটা, মাথা ঝুকিয়ে রাখা, হাতের ভঙ্গিমা, সবই খুব চেনা। আমার গলা শুকিয়ে গেলা। একেই বলে ভাগ্য। মেঘ না চাইতেই যে মিনারেল ওয়াটার দিল ভগবান। তবে কি আজ আকাশের ব্যালকনি হাউসফুল। সঠি, লাভ স্টোরি দেব-দানব সকলেই ভালবাসে।

আমি নিজেকে সাহস দিলাম। ডাবলাম, বলব। আজই বলব। শুধু প্রেম নয়, সংসাহসেরও আজ পরীক্ষা। বুকের ভিতর ওয়াখাসিরা জ্বাম পেতাচ্ছে। জলনের বাতাসে ববর পাঠাচ্ছে। মনের মধ্যকার চলমান অশরীরী স্তনতে পাচ্ছে কি?

তোশানা আরও এগিয়ে এল আমার দিকে। আমি প্রাণপণে হুঁ নিলাম সাহসের ধলিতে। জ্বামের শব্দে জাগাতে চেষ্টা করলাম খুলি শুভার সম্মতিতে। তোশানাও বোধ হয় দেখছে আমার। ও নিজেও প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। এটাই সময়। আমি শিকড় উপড়ে এক পা তুললাম। কিন্তু ঠিক তখনই গলির ও প্রান্ত থেকে একটা নশ্ব ভেসে এল। টিউ টিউ। সাইকেলে লাগানো এরোমেনের হর্ন।

তোশানা সচকিতে পিছনে তাকাল। দুর্বল আলো ঝালিয়ে, একটা সাইকেল ছড়মুড় করে এসে পলল আমাদের সামনে।

খানখানো গলা শুনলাম একটা, 'অন্ধকারে রাস্তা জুড়ে কী হচ্ছে এসব? নষ্টামো?'

॥ ৬ ॥

খানখানো গলা শুনলাম একটা, 'অন্ধকারে রাস্তা জুড়ে কী হচ্ছে এসব? নষ্টামো?'

আমি চট করে পিছনে তাকালাম। সেই দুর্বল আলো। সেই সাইকেল। চারিমিক পালাটে গেলেও খিটকমল ব্র্যান্ডিনাম টিপড নিব। পালাটান না।

দেখলাম, অন্ধকার গলির কোনায়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আর তাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলছেন বুকে। ওঃ, কী লোক। সারাক্ষণ রেগে আছেন। পোস্টমর্ডান দুর্বাস।

দশ বছর পরেও ডায়ালগটা হব্ব এক রেখেছেন কী করে মানুষটা? রোজ প্র্যাকটিস করেন নাকি? আমার হাসি পেয়ে গেল। তবে হাসির তলার সুন্দর একটা কষ্ট টের পেলাম। একদিন এই গলিতে আমরাও হিলাম। সেই ক্ষতটা আছে এখনও। ব্র্যান্ডিনাম টিপড নিব।

জীবনে কিছু-কিছু ক্ষত আছে যেগুলো সারে না। যেগুলোকে ভুলে থাকার অভিনয় করতে হয়।

আমি সাইকেলটা যেতে দিয়ে সামনে পা চালালাম। রাস্তা হয়ে গিয়েছে। আমি চাই না আমার জন্য কাবু বা কাকিমা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করুক। জিনিভা অনেক করে বলেছিল খেয়ে যেতে ওদের

বাড়ি। কিন্তু আমি খাইনি। বিকেলে বেয়নোর সময় বিলু বলেছিল, 'আজ পাকুর জন্মদিন। বাইরে খাবি না দাদাভাই। তা হলে কিছু খুব খালাপ হবে।' সেটাই মনে নিয়েছি। আমি চাই না আর কিছু খালাপ হোক।

জিনিভার সঙ্গে আমার ই-মেলে যোগাযোগ রয়েছে। ও আর ওর হাজুকও সরোজ একবার শিকাগোতে আমার ওখানে গিয়েছিল। সরোজ খুব ভাল ছেলে। শুধু মন খেলে খুব ত্যাড়াতিড়ি বিপদসীমার বাইরে চলে যায়।

আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার ডিপার্টমেন্টের বসকে একটা মেল করেছিলাম। ভিসা এখনও পাইনি। তাই ছুটিটা একটু বাড়তে হবে। আমি জানি, বস এতে রাগারাগি করবেন। কিন্তু তারপর মেনেও নেবেন। বায়ো-ফুয়েল নিয়ে যে-প্রজেক্টটা আমরা করছি, তাতে আমাদের টিমের মধ্যে বস আমার উপরই ভরসা রাখেন বেশি। তাই আমি জানি, সকলের সামনে লোক-দেখানো ঠিকার করলেও শেষমেশ ডিনি আমার সঙ্গে খুব একটা কড়াকড়ি কিছু করেন না।

মেলটা সবে পাঠিয়েছি, ঠিক তখনই ফোনটা এসেছিল। নশ্বরটা অচেনা। আমি সামান্য ইতস্তত করে ধরেছিলাম ফোনটা।

'কী রে, তুই এসে নতুন নম্বর নিয়েছিস, আমায় জানানসনি?'

জিনিভার গলা হুইইই করে স্টেশনে ঢুকে আসা লোকাল ট্রেনের মতো খেয়ে এসেছিল আমার দিকে।

'ওরে বাবা তুই।' আমি অবাক হয়েছিলাম, 'ববর পেয়ে গিয়েছিস? নশ্বরটা পেলি কী রে?'

জিনিভা হাসল, 'লোক বলতে পারিস?'

'মানে?' আমি বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জানালার কাছে।

জিনিভা বলেছিল, 'গতকাল বিদুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মলে। ও ফিল্ড সার্ভেতে গিয়েছিল। তখনই জানলাম যে, তুই এসেছিস। নশ্বরটা নিশ্চয়। আফটার অল বিজ ডেজ রুসু, ইউ হ্যান্ডনট চেঞ্জড আ বিট। সেই আমায় অ্যাক্সেস করিস।'

আমি পাশ কাটিয়ে বলেছিলাম, 'বল, কেমন আছিস।'

'আজ কী করছিস? ফ্রি?'

আমি হেসেছিলাম, 'হ্যাঁ, ফ্রি। কেন?'

জিনিভা বলেছিল, 'আমাদের এখানে চলে আয়। আনোয়ার শা রোডের এখানে। নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি। লর্ডসের মোড়ের কাছে। তোকে আমি ঠিকানাটা টেক্সট করছি। আজ সরোজের ছুটি। আয় সফ্রি। তুই তো আমাদের এখানে আসিসনি।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'তোদের ওখানে যাব কেমন করে? দশ বছর পর এলাম তো।'

জিনিভা বলেছিল, 'তুই একটা ভুত। আয় আজ। ছটা নাগাদ। কেমন?'

জিনিভা ফোনটা রাখার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওর টেক্সট মেসেজ এসেছিল। ঠিকানা আর সঙ্গে ম্যাপের একটা এলএমএস। আমি পালাটা টেক্সট করে জানিয়ে দিয়েছিলাম, ঠিক পৌঁছে যাব।

ছটাও পৌঁছেতে হবে। কিন্তু দূরত্ব বেশি নয়, তাই সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরিয়েছিলাম। এখান থেকে ট্যাক্সিতে আর কতক্ষণ লাগবে?

আমার এখন হাসি পায়। কলেজ-জীবনে বাস, অটো, মেট্রোয় করে ঘুরে বেড়াতে হত। ট্যাক্সি চড়ার মতো পরসা ছিল না। তখন মনে-মনে ভাবতাম, যখন জীবনে রোজগার করতে শুরু করব, প্রথমেই গাড়ি কিনব একটা।

কিন্তু জীবনের মজা হল, অল্প বয়সে আমরা যেসব জিনিস খুব বেশি করে শেতে চাই, সেগুলো পাওয়ার মতো বয়সে পৌঁছে দেখি সেই সব কিছু থেকে আমাদের মন সরে গিয়েছে বহু দূর।

এই যে বিশেষ একা থাকি, আমি এখনও গাড়ি কিনিনি। ওখানে আমার বন্ধুদের সকলের গাড়ি আছে। তারা আমায় নিয়মিত খোঁচাও দেয় গাড়ি কেনার জন্য। কিন্তু আমার দরকার পড়ে না।

বাড়ি থেকে ল্যাবে আমি হেঁটেই যাওয়ায়ত করি। তা ছাড়া কখনও ঘুরতে গেলে স্নেন আছে, ক্যাব আছে, বাস আছে। গাড়ির দরকানই পড়ে না। আর ওই স্নেনে ক্যাব পেতে অসুবিধে হয় না। যাব না বলে কেউ মুখের সামনে থুকে করে তামাকের লাল শিক ফেলে না।

বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বিলু শুধু ধরেছিল আমায়। মনে করিয়ে দিয়েছিল, আজ যেন রাত্রে বাড়িতেই বাই।

সামান্য বেরিয়ে একটাও ট্যাক্সি পাইনি আমি। প্রায় পনেরো মিনিট ছোটাছুটি করার পর উপায় না দেখে বাস ধরেছিলাম একটা।

বিশেষে এত বছর থেকে একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আমার। বেশি আওয়াজ, গায়ের উপর হুমড়ি বেয়ে পড়া লোকজন বেশিজন আর সত্ব করতে পারি না।

কিন্তু এমনই কপাল আমার যে, বাসটা পুরো ঠাসা ছিল ভিড়ে। আমি সামান্য দোমাননা করেছিলাম। এত ভিড়! এটায় উঠব। তারপরই নিজেই মনে-মনে গালি দিয়েছিলাম একটা। কোন লাটের বটি আমি। এই ঝল-হাওয়াতেই তো মানুষ! এই ভিড়ের ঝঁতো খেয়েই তো শরীর শক্ত হয়েছে। সেখানে এখন কী এমন হনু হয়েছে।

আমি নিজেই খুব করে ভোকাল টনিক দিয়ে তুলে দিয়েছিলাম বাসে। আর উঠেই বুকেছিলাম, বুড়া বয়সে ভোকাল টনিক খেয়ে ফুটলে মাঠে নামলে যা অবস্থা হয়, আমায়ও সেই দশ হয়েছিল।

এই দশ বছরে কলকাতায় বোধহয় মানুষ বেড়ে গিয়েছে দশগুণ, আর পাল্লা দিয়ে কমেছে তাদের সহিষ্ণুতা।

বাসে উঠেই মনে হয়েছিল, এটা বাস না ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্র। আমি ধই পাশ্চিলাম না। ভিড় আমায় ঠেলতে-ঠেলতে ড্রাইভারের পিছনের লেডিস সিটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আর স্নেনে ভাসতে-ভাসতে আমার খালি মনে পড়ছিল বহুদিন আগের একটা রাত। মনে পড়ছিল সেদিন জিনিতার সঙ্গে ঝগড়া করে আমি এমন একটা বাসে করে ফিরেছিলাম। আর আজ আবার এমন একটা বাসে করে জিনিতার সঙ্গেই দেখা করতে যাবি।

আসলে সেদিনও আমার জিনিতার সঙ্গে কোনও সমস্যা ছিল না। আজও জিনিতার সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই। সেদিনও ওকে বন্ধু ভাবতাম আজও তেমনই ভাবি। আর কে না জানে বন্ধুর কোনও ভেতান হয় না।

ভিড়ে মধ্যে টিফেচ্যাটপা হতে-হতে শুধু এটাই মনে হাঙ্কল, জীবনে কোনও-কোনও জিনিস কি ঘুরে-ঘুরে আসে? একটা গল্প শুক হলে তার কি একটা শেষ থাকেই? মোম-কাগজে মুড়ে রাখা অতীতের অশরীরীকে জীবন কি তার মোড়ক খুলে বের করে আমার আবার? মনে হয়েছিল, তাই যদি হয় তবে আমার সেই ঝগড়া আজও সম্পূর্ণ হল না কেন? এই কানিনিতে জীবন কেন তার মোম-কাগজের মোড়কটা খুলল না আজও?

থাকা খেয়ে নিশ্চিট স্টপে নেমে আমি হাঁপ ছেড়ে বেরেছিলাম। যাক বাবা, পৌঁছলাম।

এখন কলকাতার চারদিকে হাউজিং কমপ্লেক্স। বড় গেট, পিচের রাস্তা, লন, কমিউনিটি হল, ছোট সুইমিং পুল আর কাঠের বাজের মাঠে বাড়ি। এই ক'দিনেই খবরের কাগজ খুললে দেখেছি ওয়ান বিএইচকে, টু বিএইচকে বড় ঝগড়া তার ডিজিটাল ইন্সপ্যান। দেখলে মনে হয়, কলকাতার ভিতরে এ এক নতুন স্বর্গ।

আমি স্বপ্নের ঠিকানা জানি না। কোনওদিন দেখিওনি সে কেমন জায়গা। জানি না তার এমন কোনও বিজ্ঞাপন হয় কি না। শুধু জানি কলকাতার পুরনো বাড়িঘর মনে যাচ্ছে রোজ।

লিফটের চুরে চার তলায় উঠলাম। গেটে জিনিতা বলে রেখেছিল আমার কথা। তাই অসুবিধে হয়নি।

লিফটটা সুন্দর। কাচের। ভিতরে দাঁড়ালে বাইরের শহরটাকে একটা অন্য পারসপেক্টিভ থেকে দেখা যায়। দেখেছিলাম হাউসিং-এর পিছনের দিকে এক ফালি বাসমন্ডির একটা পোলনা লাগানো। পার্ক। লিফট থেকে নেমে বাঁ দিকে লম্বা টানা বারান্দা। ফোর ডি।

বাঁশি বজা দরজায় সরোজ আর জিনিতার নাম লেখা। বেল টিপে খড়ি দেখেছিলাম। ছটা কুড়ি।

জিনিতা নিজেই দরজা খুলেছিল। আমি হেসেছিলাম ওকে দেখে।

জিনিতা কিছু হাসেনি। একদৃষ্টে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর বলেছিল, 'আয়।'

আমি বলেছিলাম, 'একটু দেরি হয়ে গেল, সরি।'

'আর ফর্মালিটি করতে হবে না। ভিতরে আয়।'

আমি দরজার কাছে ছুতো খুলে ভিতরে ঢুকেছিলাম। আর ঢুকেই চমকে উঠেছিলাম। আর্ঘ! এখানে! আমার পা ঝড়ছিল না।

'কী রে রুকু!' আর্ঘ নিজেই এগিয়ে এসেছিল, 'তোমার মনে আছে আমাদের?'

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। আসলে ওর সঙ্গে আমার একেবারেই যোগাযোগ নেই।

আমি আর্ঘকে দেখেছিলাম ভাল করে। বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে। চুলে, মাড়িতে সাদা ছোপ। পাঞ্জাবি আর হাতকাটা জাকেটে অজুত লাগছে।

বলেছিলাম, 'তুই! এখানে।'

আর্ঘ একদম জিনিতাকে পছন্দ করত। কিন্তু কোনওদিনও সেটা বলে উঠতে পারেনি। সে কী করে এল এখানে?

আমি সোফায় বসে তাকিয়েছিলাম আর্ঘের দিকে।

'আমিও কিন্তু আছি স্যার,' সরোজ ভিনটে গ্রাস আর একটা বোতল নিয়ে এসে রেখেছিল টেবিলে।

আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না আর্ঘর ব্যাপারটা।

সরোজ ভিনটে গ্রাসে মদ দেবে বলেছিল, 'রুকু, আর্ঘ আমার বন্ধু। মানে, জানই তো পাৰলিশিং লাইনে আছি আমি। আর ও তো এখন বিশ্ব্যুত কুর্কি! ওকে বাড়িতে একবার নেমস্তম্ব করি, দেখি জিনিতার সঙ্গে স্নেনা বেরিয়ে গিয়েছে। তাই আজ যখন তুমি আসবে বলে, আমি আর্ঘকেও ডাকলাম।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'ডালই হল, দেখা হয়ে গেল। আর সরোজ, আমি ড্রিঙ্ক করি না।'

'ডোমায় কে দিচ্ছে বাবা! এটা আমার বউয়ের জন্য!' সরোজ হেসে প্রায়টা এগিয়ে দিয়েছিল জিনিতার দিকে।

জিনিতা একটা ট্রে-তে করে কিছু গ্যাসক এনে রেখেছিল সামনে। তারপর বলেছিল, 'তুই কী নিবি? কোন্ড ড্রিঙ্ক নে একটু!'

আমি বলেছিলাম, 'আমি এরেরেটেড ড্রিঙ্ক বাই না। এখানে এসে এমননিতেই এত তেল খাওয়া হচ্ছে। শরীরের বারোটা বাজছে পুরো।'

আর্ঘ প্রায় চুমুক দিয়ে বলেছিল, 'তুই কি রাস্পে হটবি নাকি? তোকে তো এখনও সাতাশ আঠাশ বছর লাগে। আরে, বয়সের সঙ্গে শরীরটা না বাড়লে কেউ পাশা দেয় না।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'পাশা কে পেতে চায়?'

আর্ঘ ঘুরে বসেছিল আমার দিকে। তারপর বলেছিল, 'কী বলছি তুই? পাশা তুই চাস না? এটা হতে পারে? সবাই পাশা চায়।'

'না, সবাই চায় না,' আমি স্নেট থেকে একটা ডিফেন্ড স্যাভউইচ তুলে নিয়ে বলেছিলাম, 'তুই তোর চোখ দিয়ে দেখিস বলে ভাবিস তুই তোটা চাস সেটা সবাই চায়, আসলে তা তো নয়। আমি কত মানুষকে চিনি, যারা ভাল কেরিয়ার ছেড়ে শবের জন্য বেরিয়ে পড়েছে পৃথিবীতে। জানবি আনন্দে থাকটাই আসল।'

'তুই আনন্দে আছিস?' জিনিতা তাকিয়েছিল আমার দিকে, 'তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় না। সব সময় কী মনে একটা আড়াল করার চেষ্টা করছি মনে হয়।'

আমি স্যাভউইচটা শেষ করে বসেছিলাম, 'ওসব ভাবি না। আই হ্যাভ মেড পিস উইথ মাই লাইফ।'

সরোজ এরই মধ্যে ভিনটে ড্রিঙ্ক খেয়ে নিয়ে একটু বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি তো শুক পিস করে নিয়েছ। কিন্তু জিনিতা, ও তো মাইরি এখনও ডোমায় প্রেমে পড়ে

আছে।'

আচমকা এই কথাটা শুনে আমি থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। এই রে! এসব আবার কী বলছে সরোজ।

সরোজ বলেছিল, 'কারেন্ট খেয়ে না শুরু। আমি জানি। জিনিতাই আমার সব বলছে। তুমি ওকে রিলক্ট করেছিল ফর সাম গার্ল।'

আমি ও কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। মাথা নিচু করে বসেছিলাম সোফায়। সরোজ চার নম্বর গ্রাসটা তৈরি করে তাকিয়েছিল আমার নিকে। অজ্ঞ কমলা রঙের আলোয় ডুবেছিল ঘরটা। কাচের জানালা দিয়ে অন্য বিকিরণের আলোর চৌকুপি দেখা যাক্ছিল। আমি জিনিতার নিকে তাকাতে পারছিলাম না। এমন অবস্থায় পড়ব জানলে কে আসত।

সরোজ হেসেছিল জোর গলায়, 'শালা, লাইফ কুন্ডি আছে। যে তোমায় চাইল সে তোমায় পেল না। তুমি যাকে চাইলে তাকে তুমি পেলে না। সে যাকে বিয়ে করল সেখানে তাকে...'

'আঃ, সরোজ,' জিনিতা ধমক দিয়েছিল এবার, 'কেন ষাও তুমি এসব? ইউ ডোন্ট হ্যাভ স্টম্যাক ফর ইট। আর এসব কতদিন আগের ঘটনা। ওই বয়সে এমন নানা কিছু হয়। ডোন্ট বি আ থ্রেড ডিগার।' আর্থ কথা যোরাতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা, কতদিন আছিল এখানে?'

আমি স্বস্তি পেয়েছিলাম। বলেছিলাম 'এই আছি কিছুদিন। ডিসাটা হলেই যাব।'

জিনিতা বলেছিল, 'ডিসার দরকার না হলে ও আসত নাকি? জানিস না ও এক নম্বরের স্বার্থপর।'

আমি হেসেছিলাম। স্বার্থপর কথাটা খুব আপেক্ষিক। কিন্তু এই নিয়ে কথা বাড়ালে বাড়াবেই।

বলেছিলাম, 'তা আর্থ। তোরা বাড়ি বিক্রি করলি কবে?'

আর্থ ওর গ্রাসটা শেখ করে সামনের মেট থেকে দুটো আমড তুলে নিয়ে বলেছিল, 'বছর দুয়েক ডল। বিক্রি করিনি, করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

'মানে?'' আমার আশ্চর্য লেগেছিল ওর কথাটা।

'কেন পেরেক তাকে কিছু বলেনি?'

'কী বলবে?' আমি বুঝতে পারছিলাম না আর্থ কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে কথাটা।

'আরে নীরজ সারসেশাই। পেরেক তো ওর কাছেই কাজ করে এখন। ওই নীরজই জোর করে বিক্রি করিয়েছে বাড়ি। বাবা চায়নি। কিন্তু এখন স্ট্রেট করল। পেরেক ছিল তো সামনে।'

আমি খুব অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'পেরেকের সামনে করল? আর ও চুপ করে বসে দেখল?'

'পরস্বা বস, পরস্বা।' আর্থ আর-একটা ড্রিঙ্ক গ্রাসে ঢেলে নিয়ে ছোট করে চুমুক দিল, 'পরস্বার জন্য মানুষ সব পারে। আরে এ তো বাড়ি। সম্পর্ক থাকে না। পেরেক ক্যাটালিস্টের কাজ করেছিল ডিলটা। মনে আছে, আগে কত সমাজসেবার বাতেলা করত। এখন সব গেছে। বাইক ছাড়া ধোরে না। পাটুলিতে স্ট্রাট কিনেছে। পেরেক গজাল হয়ে গেছে বস। কিছুই তো খবর রাখিস না।'

সওয়া ন'টার সময় যখন আমি উঠেছিলাম, ততক্ষণ লম্বা সোফাটার সরোজ ঘুমিয়ে পড়েছে। আর্থ নিজেও কার্পেটে বসে একটা টেবিল মাথা রেখে শুয়েছিল। শুধু জিনিতা ডবনব বসে।

আমি দরজার কাছে এসে জুতো পরে বলেছিলাম, 'আসি রে। যদি আবার কখনও শিকাগোর হাস, দেখা হবে।'

'আসবি?' জিনিতার গলাটা কেমন যেন ভাঙা শুনিয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

দেখেছিলাম জিনিতা টোট টিপে নিচ্ছেকে সামলানোর চেষ্টা করলেও এক কুচি জল গড়িয়ে নামছে ওর চোখের কোণ দিয়ে।

আমি বলেছিলাম, 'কী হল তোর?'

জিনিতা বলেছিল, 'একটা কথা বলবি রুকু। আমায় তুই এখনও

কমা করিসনি, না? আমায় ভাল না বাসিস, কিন্তু যেহা করিস না রুকু।'

'মানে?' আমি তাকিয়েছিলাম ওর দিকে।

জিনিতা হাতটা ধরেছিল আমার। তারপর আঙুলে-আঙুলে জড়িয়ে বলেছিল, 'তুই জানিস কী বলছি। আমি মানে...'

আমি হাতটা ছাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম। তারপর মৃদু গলায় বলেছিলাম, 'ওসব বাদ দে। কোনওদিনই যেহা করি না তোকে। আমার যা হওয়ার হয়েছে। আজ আসি রে। রাত হল।'

অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে দু'পা যেতেই পকেট ফোনটা নড়েচেড়ে উঠল। এখন আবার কে। আমি ফোনটা বের করলাম। বিলু। কলটা রিসিভ করে বললাম, 'আসছি রে বিলু। এই বাড়ির সামনে...'

'দাদাভাই খুব বিপদ। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। স্লিক্স, আয় জলদি।'

কাকু অসুস্থ। হঠাৎ। বিকেলে বাড়ি থেকে বেরনোর সময়ও তো দেখেছি গিবি ছিল। তবে। আমি কোনওমতে ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে সৌড়লাম।

বাড়ির গেট বুলে আমি জুতো পরেই ধরে চুকলাম। তারপর সৌড়ে উঠলাম সিঁড়ি দিয়ে। ভবে এরই ফাঁকে দেখলাম, ঠাকুরার ঘরের পরবার তলায় নীল আলো নাচেছে। হিল্লি গান শোনা যাচ্ছে। আমার বিলু লাগল। ছেলে অসুস্থ আর মা এদিকে টিডি দেখছে। এত ইনার্ট। আচমকা মায়ের মুখটা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল মা রেগে গিয়ে বলত, 'তোমার গুটি স্বার্থপর। যেমন তোর ঠাকুরা, তেমন তোর বাপ। তুই নিজেই দেখিস না? নিজে কেমন তুই আপশাপ থাকিস। আমায় জোর বাপ এত অত্যাচার করে দেখেও তুই কেমন মুখ বুজে থাকিস। তোমার রক্তটাই ধারণ। ফেলফিস। তোরা মহা সেলফিস।' কী হয়েছে রে বিলু? আমি সোজা গিয়ে ঢুকলাম কাকুর ঘরে। দেখলাম, বিছানায় কাকু শুয়ে আছে। ঘামছে খুব। কাকিমা আর পাকুর মুখে ডায়।

আমি বললাম, 'ডাক্তার ডেকেছি? হাসপাতালে নিতে হবে?'

বিলু বলল, 'পাড়ার ওইদিকে মুকুল সেন থাকেন। কার্ডিওলজিস্ট। বাবাকে দেখেন। কিন্তু মোবাইলে পাখি না।'

মুকুল সেন। আমি চিনতে পারলাম না। হয়তো নতুন এসেছেন।

বললাম, 'স্বিটকমলকে দেখাস না?'

বিলু বলল, 'বাবা পছন্দ করেন না বুড়োকে। তুই স্লিক্স একটু যাবি মুকুল সেনের বাড়ি? বললেই আসবে।'

'শিওর। কোথায় ওর বাড়ি?'

বিলু ধমকাল একটু।

আমি বললাম, 'কী হল? বল। এখন এক সেকেন্ডও নষ্ট করা যাবে না।'

বিলু তা-ও সময় নিল একটু। তারপর বলল, 'শীতলমের বাড়ির দোতলটা ওয়া কিনেছে। যাবি?'

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। শীতল। মানে তোশানাদের বাড়ি।

'সরি দাদাভাই।' বিলু হাত কচলাল, 'তোকে মানে...'

বললাম, 'আমায় গোয়িং। ডোন্ট ওরি।'

আমি সৌড়ে বেরোতে বেরোতে শুনলাম বিলু বলছে, 'দরজার বা দিকে বেল আছে দাদাভাই। ওটা টিপলেই...'

তোশানাদের বাড়ির সামনে গিয়ে আমি ধমক দাঁড়লাম। দরকারে পড়ে সাড়-পাচ না ভেবে চলে এলেও এখানে এসে পা-টা কাঁপল আমার। পেটের ভিতরে ট্রান্সজেক্টর বারে ডিসবাল্কি খেল বারোটা জোকার। আমি রবেরেত্তর কাচের জানালা লাগানো ঘরটা দিকে তাকলাম। শীতকাল, তাই জানালা বন্ধ। কিন্তু রক্তিন কাচ দেখ করে আলো আসছে বাইরে। ওই ঘরটা কার আমি জানি। জানি, তোশানা ওখানেই আছে।



নিসর্গ। শিল্পী: নন্দলাল বসু

সৌজন্য: অনাথনাথ দাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত দূরত্ব আমাদের মধ্যে? বড় জোর কুড়ি ফুট। কিন্তু সত্যি কি তাই? দূরত্ব কি শুধু দূরত্ব দিয়েই মাপা হয়।

আমি নিজেকে শব্দ করলাম। ওদিকে তাকানো তো আমার ব্যর্থণ। বলেই তো দিয়েছে। আমি মরে গেলেও নাকি...

যাকগে, আমি লোহার গোট্টা খুলে সামনের ছোট্ট চাতালটায় উঠলাম। এই তো কমন দরজা। দুটো বলে। দোতলায় থাকেন ডায়ের সেন। এই ওপরের বেলটাই হবে। আমি দু'বার চাপলাম বাটনটা। ভেতরে টিংটিং শব্দ হল।

'কে?' একটা মহিলা কণ্ঠস্বর।

আমি বললাম, 'মিক্স একটু খুলবেন। খুব দরকার মিক্স।'

খুট করে শব্দ হল একটা। তারপর সামনের দরজাটা খুলে গেল, 'কে আপ...'

প্রব্রাট করতে গিয়েও মাথাপথে আটকে গেলেন ভদ্রমহিলা।

আমিও কথা বলতে গিয়ে হারিয়ে ফেললাম সব বর্ণমালা। খির হয়ে তাকিয়ে রইলাম সামনের দিকে। বৃথতে পারলাম তুল বলে টিপেছি। আমার বুকের ভিতর ওয়াশাসিরা ড্রাম বাজাচ্ছে আবার। গ্রিপি গ্রিপি শব্দ ভেসে যাচ্ছে জমলে। আর তার মধ্যে পথঘাটানো মানুষের মতো আমি দাঁড়িয়ে রইলাম তোশানার মায়ের সামনে। করোটি শুধা তখন নির্ভন।

II চ II

'তুমি? কী দরকার তোমার?' তোশানার মা তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমি বললাম, 'ইয়ে, তোশানা কি আছে? ওর সঙ্গে খুব দরকার।' 'কী দরকার?' ভদ্রমহিলার মুখটা কি আমায় দেখেই এমন ধমধম করছে, নাকি ইনবিল্ট এমন।

আমি বললাম, 'কাকিমা, ওকে একটা ইয়ে বলার ছিল। মানে পরশু তো গুজো। তাই ও নাটকের একটা ব্যাপারে...'

'তোমাদের সকার এত নাটকের কী হুজুগ হলো তো। পেরেকটাও এসেছে সকাল থেকে।' কাকিমা বিরক্ত মুখে তাকালেন আমার দিকে। আমার মুখটা ভেতো হয়ে গেল। পেরেক? কাবাব মে পেরেক? ও কী করছে এখানে? ওঃ, সত্যি নাম সার্ক ছেলেটার।

আমি বললাম, 'ও, পেরেক এসেছে। তবে তো... মানে... আমার...' 'হ্যাঁ, তুই যা। আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি।' এবার পেরেক কাকিমার পিছন থেকে উদয় হল।

আমি তাকলাম ওর দিকে। ব্যাটা একদম ভিতরে গিয়ে সোঁদিয়েছে। এখন আমি কী করব? তোশানা যে আমায় বলেছিল, বীরপুরুষের মতো ওদের বাড়ি গিয়ে ওকে বলতে। সেটার কী হবে? আমার চোখের সামনে সেদিনের অন্ধকার গলিটা আবার ভেসে উঠল। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

সোনি বিটকমল গজগজ করতে-করতে চলে যাওয়ার পর আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তোশানার সামনে। অন্ধকার গলিতে আর কেউ ছিল না। আমি টট করে একবার আকাশের ব্যালকনিটা দেখে নিয়েছিলাম। যাক ঈশ্বর আমার সুযোগ দিয়েছেন।

তোশানা তাকিয়েছিল আমার দিকে। আবছা অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার অসুবিধে হচ্ছিল না কিছু।

আমি বলেছিলাম, 'তোশানা, আমি তোমায় কিছু কথা বলতে চাই।'

তোশানা হাতের রুমালটা দিয়ে চেপে চেপে চোঁটের উপরটা মুছেছিল। তারপর বলেছিল, 'তা বলে এভাবে অসভ্যের মতো অন্ধকারে রাস্তা আটকাতে হবে?'

'তুমি রাগ করলে?' আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

'হ্যাঁ, বিরক্ত লাগছে আমার। পাড়ার কেউ দেখলে কী মনে করবে? এমনভেঁই অন্ধকারে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে দাঁড়ালে।

লোকে গল্প বানায়। সেখানে এভাবে তুমি কেন পথ আটকাতে আমার?'

আমি বলেছিলাম, 'তোমার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমায় এখানেই পেয়ে গেলাম তাই...'

'কী তাই?' তোশানা ঝঞ্জিয়ে উঠেছিল।

আমি আরও যাবতকি গিয়েছিলাম। কোনওমতে বলেছিলাম, 'তুমি মিক্স রাগ করো না। আসলে আজ মনের ভিতরে একটা ইয়ে, মানে মোমেন্টাম আছে... তাই বলতে পারলে আজই পারব, না হলে আর পারব না বোধ হয়।'

তোশানা খির হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর বলেছিল, 'যা বলবে সেটা কি সত্যি ফিল করছ বলে বলবে, নাকি জাস্ট মোমেন্টাম এসেছে বলে?'

আমার দুটো হাতের তালু বেগে উঠেছিল। এমন জেরার মুখে পড়ব জানলে কি আর আজ এভাবে এই অন্ধকার গলিতে দাঁড়াতাম?

'কী হল?' তোশানা ঝঞ্জিয়ে উঠেছিল, 'নাকি এটা বলতে গেলেও তোমার প্রেমিকার অনুমতি লাগবে?'

'আমার প্রেমিকা?' আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। আমার জিত্ত শুকিয়ে আসছিল। ঝড়ের মুখে পড়া ডিক্টর মতো কাঁপছিল আমার বুক। মনে হচ্ছিল এ মেয়েকে সামলাই কী করে আমি? কী বলতে এসেছি আর এ কোন দিকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে কথা?

তোশানা বলেছিল, 'ন্যাকামোটা কি প্র্যাকটিস করে পারফেক্ট করছে, না সহজাত? কে প্রেমিকা জান না? যে তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসে, কোলে করে কলেজে নিয়ে আসে, নিয়ে যায়— তার কথাই বলছি।'

আমি ঘুরিয়া হয়ে বলেছিলাম, 'আরে, তুমি কীসব বলছ? তেমন হলে আমিও কী ওদের পাঠ থেকে চলে আসি এখানে? তোমায় একটা কথা উল্লেখ আমি এভাবে আসি?'

'মানে?' তোশানা এগিয়ে এসেছিল দু'পা। 'মানে, জিনিটা আজ প্রপোজ করেছিল আমায়। কিন্তু আমি ব্যর্থণ করে দিয়েছি। কেন দিয়েছি ব্যর্থণ করে? কার জন্য?'

'কার জন্য?' তোশানা গলার স্বর ওর শ্বাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

'তুমি বোঝো না? আমি... আমি...'

আমচক তোশানা এগিয়ে এসেছিল আরও। তারপর আমার জামার কলারটা আচমকা টেনে ধরে চোঁটের ওপর চেপে ধরেছিল ওর চোঁট।

ব্ল্যাক আউট। আমার চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এসেছিল আচমকা। বোমার বিমান তুমি কি ঢুকে পড়লে আমার চমকে।

আমি জানি না। শুধু মনে হয়েছিল মাটি ছেড়ে আমি দশ ইঞ্চি ভেগে উঠেছি।

আমার চোঁট থেকে চোঁট সরিয়ে নিয়ে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখটা মুছেছিল তোশানা। তারপর বলেছিল, 'যা বলার, দিনের আলোয় বাড়িতে গিয়ে বলবে। এভাবে অন্ধকারে চোয়ের মতো বলবে না। মনে থাকে যেন। আমি এসব পছন্দ করি না।'

তোশানা চলে যাওয়ার পরও হালকা লাগছিল বুঁব। পায়ের তলার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ যেন কমে গিয়েছিল হঠাৎই। মনে হচ্ছিল আমি যেন চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বুঝতে পারছিলাম, কেন প্রেমে পড়লে বলা হয়, 'আয়াম ইন দ্য মুন।'

'কী হল, যা এখন? পেরেক বিরক্ত হয়ে বলল আমায়, 'তোর কলেজ নেই? এসব নাটক-টাক কোনওদিন করেছিস। এখানে এসেছিল কেন?'

আমার মনে হল পেরেকের কানের ডলায় একটা ফাটা। শালা, এভাবে বলছে কেন মালটা। আমি কি ওর বাপের জমিদারিতে দাঁড়িয়ে আছি নাকি?

বললাম, 'তোমার কাছে এসেছি? তোর ঝাল লাগছে কেন?'
'এসব কী ভাষা?' কাকিমা রেগে তাকালেন আমার দিকে,
'তোমার কী চাই বলো তো?'

আমি টোক গিললাম। এই রে, কাকিমা রেগে গিয়েছেন।
এমনিতেই শুনেছি ডব্রমহিলা আমায় পছন্দ করেন না। তার উপর যদি
রেগে যান তো আর-এক চিন্তির হবে।

আমি তেতো মুখে তাকালাম ওদের দিকে। তারপর মাথা নিচু করে
বাড়ি ফেরার পথ ধরলাম। বুকের ভিতরটা নিম্নপাতার জ্বল হয়ে
আছে। সামনেই দুর্গা পুজো, সকলের মনে কত আনন্দ, কিন্তু আমার
ভিতরে যেন রাম-রাবণের যুদ্ধ চলছে। কারণ, এই মন নিয়ে এখন
আমায় এগারো একটা জাগরণ যথেষ্ট হবে, যেখানে যেতে মোটেও
আমার ইচ্ছে করছে না।

আমি পাড়ার মোড়ে এসে মোবাইলটা দেখলাম। তোশানাদের
বাড়ি যাওয়ার আগে ওকে একটা মেসেজ করেছিলাম। বসেছিলাম যে,
ওদের বাড়ি যাবি। ও যেন সামনে থাকে। কিন্তু মেয়েটা একটোও
রিপ্লাই করল না। আমার বেশ শুনে, গলা শুনে একবারও সামনে এল
না। এ কেমন মেয়ে রে বাবা।

সেই অঙ্কুরার গলিতে যে-মেয়েটা ছিল, যে বলেছিল আমায়
বীরপুরুষ হতে, সে কি ডব্র জেকিল ছিল, না মিস হাইড।

আমি মোবাইলটা পকেটে রেখে ছোট ভাঁজ করা কাগজটা বের
করলাম। আমার হাতটা কঁপে উঠল একটু। এখানে যেতে হবে এখন।

হ্যাঁ, যেতে হবে। মা আজ আমায় অনেক করে বলেছে এখানে
যেতে।

এর আগেও একদিন মা বেসামাল অবস্থায় ওই ঠিকানাটা
দেখিয়েছিল আমায়। তখন ব্যাপারটাও শুরু হয়নি আমি। কিন্তু মা
খুব করে বলেছে। বলেছে, 'রুকু, তুই একবার এই ঠিকানাটা নিয়ে
দেখ। সেখ, এখানে কে থাকে। ব্লিভ। আমি তোর সব কথা শুনব।
কোনও বাবে কিছু বার না। তুই এখন থাকো যা। আমি শাফিভে ঘুমাতে
পারি না। আমি জানতে চাই তোর বাবা ওখানে কার কাছে যায়। তুই
একবার যা সোনা। একবার।'

বাবা সেই টুরে যাওয়ার নাম করে যেখানে গিয়েছিল, সেখান
থেকে ফিরে এসেছে। মা খুব অশান্তি করেছিল বাবা আরায়ের।
জিজেস করেছিল বাবা টুরের নাম করে কোথায় গিয়েছিল, কিন্তু
প্রতিবারের মতো এবারও বাবা কোনও উত্তর দেয়নি। নির্ধিকার মুখে
নিজের কাজ করে গিয়েছিল।

এই উত্তরহীনতা, এই নির্ধিকার ভাব মাকে আরও পাগল করে
তোলে। কিন্তু করে তোলে। মা তখন চিংকার করে। জিনিস ছোড়ে।
মদ খায়। ঘুমের ওষুধ কোন্ড ড্রিভে গুলে খায়। আমি দেখি বাবাকে
কিছু করতে না পেরে মা নিজেই ছিড়ে ফেলে রাগের সমকে।

আমার সবচেয়ে অবাক লাগে ঠাকুমাকে দেখে। এ ঘরে যে প্রলয়
চলছে সেটা কি শোনে না ঠাকুমা? নাকি পাভা সেয়ে না? মা সেই যে
ঠাকুমাকে খাভা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল, তারপর থেকে ঠাকুমা আর
কথা বলে না। মায়ের সঙ্গে। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, ছেলে
অন্যায় করছে ছেলেও সেটা নিয়ে কিছু বলবে না।

মা আজ বলেছিল, 'রুকু, তোর বাবা এ মনে একটা টাকাও
বাড়িতে দেয়নি। কাজের মেয়ের মাইনে, পুজোর শাড়ি, জন্মদায়ের
টাকা আর বোনাস, সব আমার এমআইএস-এর টাকা থেকেই নিতে
হচ্ছে। তুই বোঝ বাবা একটু। একবার খবর নে এই ঠিকানায়। কার
নিছনে তোর বাবা টাকা ওড়াচ্ছে একটু দেখ। তুই বড় হয়েছিস, তুই না
দেখলে আমায় কে দেখবে বল। আমি নিশ্চিত, ওখানে তোর বাবার
আর-একটা সংসার আছে।'

আর-একটা সংসার। মা যে কী বলে। কল্পনারও তো একটা মাত্রা
থাকে। কিন্তু আমি জানি, এ ব্যাপারে বেশি কিছু বললে মা অশান্তি
করবে। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে নিয়েছিলাম চিরকুটটা। কিন্তু মনে-
মনে জানি এসব কিছু নয়। বাবা যে জুয়া-সাঁটা ধরছে সেখানেই

নিশ্চয় টাকা গিয়েছে। এই ঠিকানায় যাওয়াটা যে ফালসু হবে, সেটা
মনে-মনে বুঝতে পারছি আমি।

আসলে আমার মাথায় এখন তোশানা ছাড়া আর কিছু ঘুরছে না।
ওই অঙ্কুরার গলিটা ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না। তাই মায়ের থেকে
ঠিকানাটা নিলেও আমি ওসব বাদ দিয়ে ছুটেছিলাম তোশানাদের
বাড়ি।

কিন্তু কী হল। মেয়েটা তো বেরোলেই না। বরং পেরেককে দিয়ে
আমায় ফুটিয়ে দিল।

আমি গীর্ধাশাস ফেলে আবার চিরকুটটা দেখলাম। শোভাবাজারের
ঠিকানা। কোথায় এটা? আমি ওমিকটা চিনি না বিশেষ। কিন্তু তা-ও
যেতে তো হবেই। দূর, ভাল লাগে না। নাও, বুনে হাঁস ত্যাগ করে
বেড়াও এখন। তবে এটাও ঠিক, একবার গিয়ে মায়ের মনের সন্দেহটা
দূর করাও দরকার। জানি, বাবা বাইরে ভুলভাল কাজ করে বেড়ায়।
কিন্তু মা যেমন আশঙ্কা করছে তেমন বাধা কেউ যে নেই বাবার, সে
ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কারণ, আমার মনে হয় গংবাধা সংসার করার
লোক আমার বাবা নয়।

শোভাবাজার যেতে হলে মেট্রোই ভরসা। আমি পাড়া থেকে
বেরিয়ে রবীন্দ্র সরোবরের দিকে হটা দিলাম।

আজ চতুর্থ। কলকাতার পুজোর সাজ একসম চূড়ান্ত পর্যায়ে
চলছে। ফুটপাথে হলুদ-কালো রং করা সম্পূর্ণ। ফুটপাথের ধার দিয়ে
বিশের ব্যারিকেডও করা হয়েছে। আর আছে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং। কত
লোক। কত আনন্দ। কত ইইচই। কত আলো। কিন্তু আমার মধ্যে এমন
গীর্ধা লোডশেডিং কিন্ত? কেন এমন মনখারাপ? কবে ভাল হল আমি?

চারদিকে তাকালাম। সকালের কলকাতা। ব্যস্ত, তৃপ্ত মুখের ভিড়।
আমি তার মধ্যে আমার মতো বাল্ব-কাটা মুখ খুঁজলাম। দেখতে
পেলাম না। একটোও। আমার মায়ের মুখটা মনে পড়ল। সকালেও
কর্মছিল। আমি কি অমানুষ হয়ে যাবি ক্রমশ? মায়ের ওরকম কষ্ট
কেনও আমি কী করে গোলাম তোশানাদের বাড়ি?

একটা মিথির দোকানের সামনে গিয়ে হাটার সময় শোকসের
কাতে আমি নিজের মুখটা দেখলাম। আমার মধ্যেও কি একটা বাবা
বঁচে আছে? যে নিজের ইচ্ছে ছাড়া আর কিছু বোঝে না?

আমার নিজেকে ভাল লাগল না। মনে-মনে ঠিক করলাম,
তোশানার কাছে আর যাব না নিজে থেকে। আমি বরং বাড়ির দিকে
মনোযোগ দেব। বাবাকে বলব এবার। এই বাইরে সময় কাটানো
থেকে শুরু করে সাঁটা খেলা, সব কিছু নিয়েই। বলব, অনেক
হয়েছে, এবার একটা ভাল আর সুস্থ জীবন চাই আমার। ছোটবেলায়
যে-বাবার হাত জড়িয়ে ঘুমোতাম, তাকে ফেরত চাই।

মেট্রোর সুড়ঙ্গ ঢুকলেই আমার মনে হয় কলকাতার শিরার ভিতর
ঢুকলাম। গেটের কাছে ঘুঁজন থাকি পোশাকপরা পুলিশ বসে রয়েছে।

ঘুঁজনের মুখই ভাবলশহীদ। যেন তাকিয়ে থাকতে হয়, তাকিয়ে
আবে। যেন অ্যাক্সারিয়ামের মাছ দেখছে।

এখন পুজো মানেই ভিড়। শপিংয়ের ভিড়। টিকিট কাউন্টারের
সামনে লম্বা লাইন। আমায় তো রোজ মেট্রোয় যেতে হয় না, তাই
মাছলি নেই। আমি দেখলাম চারটে কাউন্টার খোলা। তার সামনে
করোয়ান তেল নেওয়ার মতো লাইন লম্বা হয়ে সেজের দিকে গুটিয়ে
আছে।

ওরে বাবা। আমি পকেটের খুচরা শুনে এগোলাম কাউন্টারের
দিকে।

'এই রুকু, এই রুকু।'

গলটা শুনেই আমার বুকের ভিতরটায় রক্ত চলকে উঠল। এ কার
গলা শুনছি। কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম আমি। ডান করলাম যে,
আমি কিছুই শুনিনি। কেন শুনব। আমার একটা প্রেস্টিজ নেই?

আমি পাড়া না দিয়ে সরাসরি দিকে এগোলাম।

'আরে, আচ্ছা ছেলে তো।' এবার পিছন থেকে এসে আমার
জামাটা ধরে টান মারল তোশানা।

আমি বললাম, 'আন্তে, জামা ছিড়ে যাবে।'
'কান ছিড়ে দেব,' তোশানা ঠোঁট কামড়ে তাকাল আমার দিকে।
আমি চোকে গিললাম। ভরা স্টেশনে সবাই আমাদের দিকে
তাকালে।

বললাম, 'কীসব বলছ। সবাই দেখছে। সিন ক্রিমেট হচ্ছে
একদম।'

'বেশ হচ্ছে।' তোশানা বলল, 'ডাকছি, শুনছ না কেন?'
আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। লাইন বাড়ছে
আরও। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

'কী হয়েছে? কথা বলছ না কেন?' তোশানা ঠোঁট কামড়ে তাকাল
আমার দিকে।

আমার গলার কাছে গিট বেঁধে গেল। এভাবে কেউ তাকায় কারও
দিকে? এভাবে তাকালে রাগ করে থাকে যায়? আমার চোখ ওর
আলতো টোল-পড়া খুঁতনি আর ঠোঁটের দনুকে আঁকে গেল। এগুলো
দেখতে নেই। কিন্তু আমার পাশী চোখ তো এগুলো দেখবেই। না হলে
আর নিজেকে গাড্ডায় ফেলব কী করে। এই জনা, শুধুমাত্র এই জনাই
আমার নিজেই পছন্দ নয়। নিজের পায়ে কুড়ুল মারা এক ব্যাপার,
আমি তো কুড়ুলেই নিজের পা-টা মেরে বসে থাকি।

তোশানার দিকে তাকিয়ে নিমেষে সব মুছে গেল আমার। ভুলে
গেলাম ওর মায়ের মুখ, পেরেকের কথা, ওর বেরিয়ে না আসা।
এমনকী, শোভাবাজারের ব্যাপারটাও উবে গেল মাথা থেকে। শুধু
চারার জুড়ে পিয়ারমিস্টের তুমারপাত শুক হল আমার।

তোশানা চোয়াল শক্ত করল এবার। বলল, 'ঠিক আছে, বলতে
হবে না কথা। আমারই ভুল হয়েছে। আমি এগলাম।'

এই সেরেছে। এ যে আমার ওপর রাগ করছে। মনটা রূপণ
ঘোড়ার মতো টিটি করে উঠল।

আমি তোশানার পিছন পিছন এগোলাম। বললাম, 'আরে, তুমি
রেগে গেলে নাকি? আমি রাগ করব কেন? কী মশকিল। এত রাগী
কেন তুমি? সারান্ধণ এমন রাগারাগি করলে তো হাই প্রেশার হয়ে
যাবে। এমন করতে নেই।'

তোশানা টট করে দাঁড়িয়ে পড়ল এবার। বলল, 'আমার পিছন
পিছন এলেই হবে? এটা কি সোলকটা ট্রেন যে, উইপাউট টিকিট
যাবে? যাও টিকিট কলো।'

আমি দেখলাম, সত্যি অনেকটা দূর চলে এসেছি লাইনের কাছ
থেকে।

বললাম, 'জাস্ট ওয়েট, আমি টিকিটা কেটেই আসছি।'
লাইন লম্বা হলেও ফ্রুট এগোল সামনের দিকে। টিকিট কেটে
দেখলাম তোশানা গেট পেরিয়ে ওপিকে চলে গেছে। আমায় দেখেই
বলল, 'ভাড়াভাড়া করে, ট্রেন আসার সময় হয়ে গিয়েছে।'
ট্রেনে ভিড় বুঝ। আমার মাঝামাঝি উঠেছি। ও নামবে এমজি
রোড।

তোশানা বলল, 'কী হয়েছে তোমার? গোঁজ হয়ে আছ কেন?'
আমি বললাম, 'কী বলেছিলে মনে আছে? বলেছিলে, তোমার
বাড়িতে গিয়ে আমার যা বলার তা তোমায় বলতে। আজ তো
গিয়েছিলাম সকালে। তুমি তো পেরেকের সঙ্গে গল্প করছিলে। তা-ও
বেরোলে না তো। উলটে পেরেককে দিয়ে আমায় বের করে দিলে।
মেসেঞ্জার রিগ্রাই দিলে না।'

'বের করে দিলাম মানে?' তোশানা আচমকা কুট করে চিমটি
কালি আমার হাতে, 'আমি ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম? কলোজে যাব
বলে দ্বন্দ্ব করে থাকিলাম। প্রাস মোবাইলটা বন্ধ করে চার্জে
সময়েছিলাম। আর আসতে বলেছি মানে আজই আসতে হবে?
পাগল নাকি তুমি?'

আমি চুপ করে গেলাম। ওর সঙ্গে তর্ক করব না। করে লাভও
নেই।

তোশানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি একটু সময় নিলাম উত্তরটা দিতে। বললাম, 'শোভাবাজার।
একটা ব্যক্তিগত কাজ আছে।'

'সমষ্টিগত কাজ তুমি করো না জানি। পাড়ার পূজোতেই কোনও
পার্টিশিপেদার নেই তোমার। পেরেক বলছিল তুমি বুঝ সেন্সিভ
সেন্টার।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমি সার্ভার। জানি। পেরেক যখন বলেছে
তখন তো সত্যি হবেই।'

'রাগ করলে?' তোশানা ভিড়ের মধ্যে আলতো করে আমার
হাতটা ধরল।

'নাঃ,' মাথা নাড়লাম আমি, 'কী হবে রাগ করে।'

তোশানা আর কিছু বলল না। বুঝলাম, কোথায় যেন সুস্থভাবে
হলেও ভাল কেটে গিয়েছে। ও একটু সরে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে
অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখতে লাগল। আমারও কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।
মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি ফুটিবার মতো নেমে আসছে ধীরে-
ধীরে। ট্রেন এক-একটা করে স্টেশন পেরোচ্ছে, আর আমাদের ডর
লাগতে শুরু করেছে এবার। যদিও তাকে আমি বলেছি বাবার সম্বন্ধে
এসব ভুলভাল না ভাবতে, তা-ও এখন নিজেরই ভয় লাগছে।

এমজি রোডে তোশানা নেমে গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলল,
'তুমি আমায় ডুল বুঝলে। তুমি মেয়ে হলে বুঝতে মায়ের বিরুদ্ধে
যাওয়া কত কঠোর। তা-ও আমি...'

কী বলতে গিয়েছিল তোশানা? কী বলল না? আর কি
কোনওকিনও যথেষ্ট সেই অসম্পূর্ণ বাক্যটা? আমি ভাবলাম, এখন যদি
আচমকা ট্রেনটা অ্যাকসিডেন্ট করে, আমার তো আর কোনওকিনও
জানাই হবে না কী বলতে চেয়েছিল ও।

ধীরে-ধীরে স্টেশন ছাড়ল ট্রেন। তোশানা প্ল্যাটফর্ম থেকে দূরে
দৃষ্টিতে প্রাণীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমিও যতটা পারা যায়
তাকিয়ে রইলাম তোশানার দিকে। বুঝতে পারলাম আসলে আমি আর
হাস্ত্যর নেই। যতটুকু আমার ছিল সবটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে-
মনে বললাম:

'here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life; which grows
higher than soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart

i carry your heart (i carry it in my heart)'

শোভাবাজার স্টেশনে নেমে আমি কলকাতার শিরা থেকে তার
চামড়ার উপরে উঠে এলাম। স্টেশনের পাশেই একটা পানের দোকান।
আমি সেখানে গিয়ে কাগজটা বের করে দেখলাম, 'শালা, এই
টিকানাটা কোথায় হবে?'

দোকানে বেশ ভিড় আছে। লোকটা আমায় হাতের ইশারায়
দাঁড়াতে বলল একটু। আমি একপাশে সরে দাঁড়ালাম। আমার
টেনশনটা বেশ বেড়েছে। কে থাকে এই টিকানায়? আমি যে ভরসা
নিয়ে মাকে বসি, বাবার এমন কোনও সম্পর্ক নেই, সেই ভরসাটা
হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছে মন থেকে। গলটা শুকনো লাগছে। মনে হচ্ছে
কী দেখব এখানে গিয়ে।

লোকটা এবার হাত বাড়াল। আমি টিকানা লেখা কাগজটা এগিয়ে
দিলাম। লোকটা দেখল সোঁটা। তারপর ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ তো
সমনবেই। হেঁটে পাঠ্য মিনিটা। এই পাঠ্য সোজা চলে যাও। প্রথম
গলিতে ঢুকে বাঁ দিকের বাড়ি। সোজা।'

আমি ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটার দেখানো পথে পা বাড়ালাম।
গলিটা ছোট। অন্ধকার। কেমন স্যাঁতসেঁতেও। রাস্তার পাশে ময়লা
তৃণ করা। আমি দেখলাম, কালো কালিতে বাড়ির নম্বর লেখা। এটাই

তো। আমি ঠিকানার সঙ্গে মেলালাম।

বাড়িটা খুব পুরনো। আগেকার কাঁট আয়রনের কড়িঝড়গা দেওয়া ঝুলবারান্দা দেখা যাচ্ছে সোডালায়। সদর দরজাটাও মোটা। লোহার চাকি লাগানো। বাড়ির বয়স একশো বছরের উপর হলে আমি আশ্চর্য হব না। গোটা বাড়িটার কী রং ছিল, আর বোঝার উপায় নেই। মাস্টার ঘরে পড়ছে এখনো-ওখানে। নমনতারা গাছের বাচ্চা এক পাশের সেওয়াল ফাটিয়ে সোল খাচ্ছে।

আমি সেখানাম দুটো কাঠের জানালাই বন্ধ। বাড়িতে কি কেউ নেই? আমার খিঁচা হচ্ছে। নিজের জীবনকে গোয়েন্দা গল্পের শেষ পাঠ্যর মতো লাগছে।

আমি সিঁড়িতে উঠে জোরে কড়া নাড়লাম এবার। তারপর আবার নেমে এসে ফুটপাথে দাঁড়লাম। এক-একটা সেকেন্ডকে কে যেন টেনে এক স্বপ্নার সমান করে দিয়েছে।

খুঁট করে শব্দ হল। মোটা দরজাটা বুলে গেল আমার সামনে। একটা মেয়ে। বাচ্চা। একমাথা কৌকড়া চুল। বড়-বড় চোখ। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছি আমার দিকে।

আমি নড়তে পারলাম না। কথা বলতে পারলাম না। শুধু দাঁড়িয়েই রইলাম। ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো তাকিয়ে রইলাম ওই বড় টানা-টানা চোখের দিকে। এই চোখ আমার খুব চেনা।

আমার পা কাঁপতে শুরু করল। বুকের ভিতর পাড় ভেঙে পথ বদলাতে শুরু করল নদী। আমি বুঝতে পারলাম, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন চিরকালের জন্য বদলে গেল। আমি তাকিয়ে রইলাম ওই ছোট মুখটার দিকে। আনন্দের দিকে।

॥ ৭ ॥

টানা-টানা চোখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। যেন কেউ আনন্দের পরেই আমার সামনে। দশ বছরে আমার বুকের নদী শান্ত হয়ে গিয়েছে অনেক। কিছুটা ক্লান্তও হয়েছে। আর তার পাড় ভাঙার উদ্যম বা শক্তি নেই। ভাঙুরের বয়স এই নদী পেরিয়ে এসেছে অনেক দূর। তুঁট চোখ দুটো দেখে আশ্চর্য চমকে উঠলাম একটু। গভজাল থেকে শীত পড়েছে। আমার যদিও খুব একটা গরম লাগছে না, কিন্তু আশপাশের লোকজনকে দেখে বুঝতে পারিই ব্যাপারটা।

আজ দুপুরে ই-মেলে জানতে পেরেছি ভিসা হয়ে গিয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যে কনসুলেটে যেতে হবে একবার। বাকি ফর্মালিটিটা সেরে নিতে হবে।

দুপুরে খাবার খেয়ে আমি ঠাকুরার কাছে গিয়েছিলাম একবার। সেই রাতের ঘটনার পর ঠাকুরার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। ঠাকুরা ভেমন কিছু হয়নি। উদ্বেজিতভাবে প্রশ্নারটা বেড়ে গিয়েছিল শুধু। আর গ্যাস থেকে বৃকে ব্যথা হচ্ছিল। তবে ডাক্তার সেন এসে বলেছিলেন যে, বিপদ ঘটলেও ঘটতে পারত।

সেদিন কিছু না বুঝতে পারলেও পরের দিন বিলুর কাছে জেনেছিলাম ব্যাপারটা। কাকু আর ঠাকুরার মধ্যে নাকি বাড়ি নিয়ে খুব ঝামেলা হয়েছিল।

ঠাকুমা বলেছিল, 'নিজের মুরাদ নেই, বাপের তৈরি করা বাড়ি বিক্রি করে টাকা করবে। আমার পেটে এমন মেনিমাখো লমতান জন্মেছে ডাবলে নিজের উপরই ঘোরা হয়।'

এর পরেই নাকি কাকু প্রচণ্ড চিন্তার করতে থাকে। ঠাকুমাও পালাটা উত্তর দিতে ছাড়েনি। এসবের মধ্যেই কাকু অসুস্থ হয়ে পড়ে।

বিলু আমায় বলেছিল, 'এটা বাড়ি নয় রে দাদাভাই। নরক। আমি জানি তোকে কী সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু তুই চলে গিয়ে বৈচে গিয়েছিলি। আমিও চলে যাব। এমএ-টা হয়ে যাক। কলেজ-টলেজের চাকরির পরীক্ষা দিয়ে চলে যাব দূরে কোথাও।'

দূরে? মানুষ দূরে চলে গেলেই বৃথি ভাল থাকে? সব ভুলে থাকে?

দূরে যাওয়া মানে তো একটা শরীর থেকে আর-একটা শরীরের দূরত্ব তৈরি হওয়া। কিন্তু মন? তার কী হবে? সে কি দূরে যেতে পারে। ভাল থাকতে পারে?

এই তো আমি দশ বছর দূরে থেকেছি সব কিছু থেকে। কিন্তু সত্যি কি আমি দূরে ছিলাম? এখানকার প্রতিটা মুহূর্ত কি আমায় ব্লেন্ডের মতো ভিরে সেদিন ভিতরে ভিতরে? আমার বারবার মনে হয়, মানুষ সশরীরে যেখানে থাকে সেটা কি তার বাড়ি, নাকি যেখানে তার মন পড়ে থাকে সেটাই তার বাসস্থান। আমি শপথ জানি না। যখন মনে হয় সব তো ভুলে গিয়েছি, সব কিছু থেকে দূরে থেকে তো ভালই আছি, তখনই সেখান থেকে কোনও এক রাতে স্বপ্নের মধ্যে কয়েকটা ঘুম ভেঙ্গে ওঠে। সেটা-অন্ধকার ভেসে ওঠে। আর আমার ঘুম ভেঙে যায়। একা বিছানার ভুতের মতো বসে থাকি। চোখে জল আসে খুব। সেখি অন্ধকার এক গলি। চৌটার উপর চৌটা। সেখি, বাবার পাশে শুয়ে গল্প শুনছে ছোটবেলার রুকু। সারা উঠোন জুড়ে ছুটে ছুটে পান করছে দামাল এক রুকু। সেখি, আমার অল্পবয়সি মা ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসছে। এই সব ছেড়ে এতদূর বিদেশে আমি কি সত্যি ভাল আছি? আমি কি ভাল থাকি? দূরে সরে গিয়েও আমি কি কোনওদিন পারলাম দূরে সরে যেতে?

বিলুকে আমি কিছু বলিনি। সব কথা বলা যায় না অন্যকে। জীবনে কিছু জিনিস আছে, যা নিজেকেই খুঁজে বের করতে হয়। নিজের সত্যিটুকুর কাছে খুঁজে-খুঁজে নিজেকেই পৌঁছাতে হয়।

আমি ঠাকুরার ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম লেপের ভিতরে প্রায় ভুবে শুয়ে আছে ঠাকুমা। 'কিছু বলবি?' ঠাকুমা মুখটুকু ভাসিয়ে তুলেছিল লেপের উপর। আমি একটা মাস্টিকের চেয়ার টেনে বসেছিলাম ঠাকুরার বিছানার পাশে। তারপর বলেছিলাম, 'তোমায় একটা কথা বলতে এলাম ঠাকুমা।'

সে কী রে? তুই কি তোর অংশটাও বিক্রি করে দিবি?' 'মানে?' আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ঠাকুরার দিকে। ঠাকুমা বলেছিল, 'মানে, তোর কাকু তো খেপে উঠেছে। ও এই বাড়ি বিক্রি করে দেবেই। ওই নীরজ না কোন এক লোক। সে নাকি ভাল দাম দেবে। ফ্রাট দেবে। তোকে তো বলেছি।' আমি বলেছিলাম, 'আমি সেজন্য আসিনি ঠাকুমা। আমি এসেছি অন্য কারণে।'

'কী কারণে?' ঠাকুমা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি বলেছিলাম, 'তোমার কখনও আর কারও কথা মনে পড়ে ঠাকুমা?'

'আমার? আর কার...' ঠাকুমা কথাটা শেষ না করে থমকে গিয়েছিল। তারপর হরি হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে, 'তুই কি গুর কথা বলছিলি?'

আমি বলেছিলাম, 'আজ সোনারপুর যাব।'

'সোনারপুর?' ঠাকুমা অবাক হয়েছিল, 'ওখানে কেন? তুই কি কোনও খবর পেয়েছিস?'

আমি বলেছিলাম, 'দেখি গিয়ে।'

ঠাকুমা চুপ করে ছিল একটু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'দেখ, যা ভাল বুঝিস। তোকে আমি আর কী বলব এই ব্যাপারে। তবু রুকু, একটা অন্য কথা বলি। জীবন এভাবে চলবে না। এবার সত্যি বিয়ে কর একটা। সঙ্গী হোক তোরা। ওই দেশে কোনও মেম পছন্দ হলে তাকেই কর।'

আমি হেসে বলেছিলাম, 'মেম? ও আমার হবে না। ওদের সঙ্গে আমার খুব একটা মিলে না।'

ঠাকুমা লেপের তলা থেকে একটা হাত বের করে ধরেছিল আমার হাত। তারপর বলেছিল, 'আমি জানি তোর অনেক কষ্ট। কিন্তু সেসব নিয়ে পড়ে থাকলে হবে? সেই মেয়েটারও তো শুনি ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে। খুব কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। এই পাড়াতেই তো থাকে। ওর

সঙ্গে তোর কথা হয়?’

আমি কিছু না বলে জানালার দিকে তাকিয়েছিলাম। রোদ আসছিল জানালা দিয়ে। তাতে সোনালীকণ্ঠের মতো খুলো উড়ছিল। একটা কাক এসে বসেছিল বাইরের গাছে। রাস্তার টিকবয়েল থেকে ঝকঝক শব্দ আনছিল জল পান্স করায়। আমি কথা বলতে পারছিলাম না কোনও। নির্জন পুপুর তার নিজস্ব আওয়াজ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল আমার ভিতরে।

ঠাকুমা বলেছিল, ‘রুকু, তোর মনে কি এখনও মাঝা আছে ওর জন্য?’

আমি রাস্তায় বেরিয়ে ডেবেছিলাম কীসে যাব সোনালপুর? ট্যান্ডিতে নাকি ট্রেনে? তারপর ডেবেছিলাম, ওখানে গিয়ে তো খুঁজতে হবে টিকানাটা। সেটা গাড়ি চড়ে সম্ভব নয়। আমি ঠিক করেছিলাম ট্রেনেই যাব।

বহুবছর লোকাল ট্রেন চড়িনি। কিন্তু টালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন করে বলিগঞ্জ জংশন হয়ে সোনালপুর যেতে হয়, সেটা মনে আছে।

আমি গলি দিয়ে শটকাট করব বলে জোরে পা চালিয়েছিলাম। কিন্তু একটু যেতেই পেরেকের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। পেরেক ওর বাইকটা দিয়ে আমার সামনের রাস্তাটা আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। আমার বিরক্ত লেগেছিল খুব। বলেছিলাম, ‘কী রে, রাস্তা গার্ড করলি কেন?’

পেরেক হেসে বলেছিল, ‘শালা, তুই তো পান্ডাই দিস না আমার। সেদিন দেখা হল তারপর নো নিউজ। মেসেজ করলে উত্তর দিস না। ফোন করলে থরিস না। কেন রে?’

‘সর পেরেক, দরকারি কাছে যাচ্ছি।’

পেরেক বাইক থেকে নেমে স্ট্যান্ড করেছিল গাড়িটা। তারপর বলেছিল, ‘শোন, আমারও ফালতু মজগামারি করার টাইম নেই। তোকে একটা দরকারি কথা বলতে এলাম। নীরজনা তোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।’

‘কেন?’

‘সেটা নীরজনাই বলবে। তুই আজ আসতে পারবি দাদার বাড়িতে? সামান্য অ্যাডমিনিউতে।’

‘দরকারটা কার?’ আমি তাকিয়েছিলাম পেরেকের দিকে।

‘মানে?’ পেরেক অবাক হয়েছিল এবার।

বলেছিলাম, ‘শোন, তোর নীরজনার দরকার হলে আমার কাছে আসতে বলিস। আমার তার সঙ্গে কোনও দরকার নেই। সেখ পেরেক, তুই আমার ছোটবেলার বন্ধু, তোকে এভাবে বলতে খারাপ লাগবে। কেন নীরজ আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই ওকে মদত দিস না। আর্থ বলেছে, তোরা কীভাবে জোর করে ওদের বাড়িটা কবজা করেছিল। যে চোর হয় সে-ও নিজের কাছের লোকদের বাড়িতে সিন দেয় না। তুই ভেবে দেখিস। অবশ্য অন্যের জিনিসে সিন দেওয়া তো তোর জমগত।’

‘মানে? শালা কী বলতে চাইছিল তুই?’ পেরেক চোয়াল শক্ত করেছিল।

আমি বলেছিলাম, ‘গত দশ বছরে যত বড় মাতানই হয়ে উঠিস না কেন, তুই আমার কাছে কিছু সেই পেরেক, যে এসবিভিউট হলে কিছুতেই আউট দিতে চাইত না। সর, আমার যেতে হবে।’

আমি পেরেকের বাইকের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। জানি, পেরেক হয়তো রেগে গিয়েছে আমার উপর। কিন্তু কিছু করার নেই। আমি আর সেই পুরনো ছেলোটা নই যে, খামেলার ভেঙ্গে সব কিছু মুখ বন্ধ করে মেনে নেব, চোপে রাখব। একা থাকলে মানুষের শিরদাঁড়া আপনা থেকেই শক্ত হয়ে যায়।

সোনালপুর স্টেশনে নেমে আমি সময় নিয়েছিলাম একটু। বিকেলের ট্রেন এসেছি। বেশ ভিড় স্টেশনে। আমি প্ল্যাটফর্মের একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। পকেট থেকে টিকানাটা বের করে

দেখেছিলাম আর-একবার। কামরাবাদ স্ট্রুলের পাশের গলিতে যেতে হবে। কিন্তু এই স্ট্রুটা কোথায়?

পাশে একটা ছোট চারের সোকান। আমি এগিয়ে গিয়ে টিকানাটা জিঞ্জেস করেছিলাম সোকানদারটিকে। লোকটা বলেছিল, জায়গাটা খুব একটা দূরে নয়। হেঁটেই যাওয়া যাবে।

সেই হেঁটে টিকানা খুঁজে এসেছি আমি। ছোট একতলা বাড়ি। মাথার উপর টালি দেওয়া। দেওয়ালে প্লাস্টার নেই। ইটের উপর শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। চারদিকটা গাছপালার জন্য কেমন যেন ছায়া-ছায়া। কেমন যেন মনখারাপ রক্তের একটা আলো লেগে আছে বাড়িটার গায়ে। আমি দরজার কড়া ধরে নেড়েছিলাম। তারপর পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করছিলাম। একটু সময় পরে খুঁট করে খুলে গিয়েছিল দরজাটা।

টানা-টানা চোখ দুটো তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। যেন কেউ আদ্যনা ধরছে আমার সামনে। দশ বছরে আমার বুকের নদী শান্ত হয়ে গিয়েছে অনেক। কিছুটা স্নানও হয়েছে। আর তার পাড় ভাঙার উদ্যম বা শক্তি নেই। ডাঙরুরের বয়স এই নদী পেরিয়ে এসেছে অনেকদিন। সব চোখ দুটো দেখে আচ্ছও চমকে উঠলাম একটু।

‘দাদা?’ বিধা নিয়ে আমার দিকে তাকাল ঝড়ি।

আমি বললাম, ‘ঝড়ি তো, না?’

‘আপনার মনে আছে?’

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। মনে থাকবে না কেন? এ জিনিস কেউ কোনওদিন ভোলে?

ঝড়ি বলল, ‘আপনি ভিতরে আসুন। কী করে খুঁজে পেলেন আমাদের?’

আমার বিধা হল। তা-ও ভিতরে ঢুকলাম। একটা ছোট বারান্দা।

বীহুসেই একপাশে জুতো খুলে রাখলাম আমি।

‘ঝড়ি বলল, ‘ছোট পরেই আসুন না। কিছু হবে না।’

আমি উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতরে পা রাখলাম।

ছোট ঘর। তবে খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরে আসবাব বলতে একটা ছোট টেবিল। আলনা আর টেবিল। টেবিলের উপর বইখাতা দেখে বুঝলাম, এটা ঝড়ির পড়ার জায়গা। আমি চারপাশে তাকলাম। ঘরের একদিকে জানালা। তাতে শাড়ি কেটে তৈরি করা পরদা। অন্যদিকে আর-একটা দরজা। বুঝলাম, ওইদিকেও একটা ঘর আছে।

ঝড়ি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বলল, ‘আপনি বিহানাতেই বসুন না। মানে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে। আসলে যা পাশের বাড়ি গিয়েছে। এল বলে।’

আমি বিহানায় বসলাম। তারপর সাইড ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, ‘এটা তোমার জন্য।’

‘আমার?’ ঝড়ি যেন বিশ্বাস হল না। হাতও বাড়াল না।

‘হ্যাঁ,’ আমি প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখলাম।

ঠিক তখনই শব্দ করে খুলে গেল দরজাটা। দেখলাম, একজন ভদ্রমহিলা ভিতরে ঢুকলেন। আমার বুকের ভিতরটা কীশে উঠল আচমকা। নিজেকে তো প্রস্তুত করেই এসেছিলাম। তা-ও এমন মনে হল কেন।

ভদ্রমহিলা কী একটা যেন বলতে গিয়েছিলেন ঝড়িকে। কিন্তু আমার সেখ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। ঘরের অল্প আলোতেও বুঝলাম, পুরো ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছেন উনি।

আমি চোয়াল শক্ত করে নিজেকে সংযত করলাম। তারপর হাতজোড় করে নমস্কার জানালাম।

ভদ্রমহিলা কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। তাকিয়ে রইলেন।

আমি ঝড়িকে বললাম, ‘তুমি আমার ইউনিভার্সিটি মেলে যে চিঠি লিখেছ, সেটা আমি পেয়েছি। কিন্তু তাতে মোবাইল নম্বর দাওনি কেন?’

ঝড়ি চট করে একবার ভদ্রমহিলাকে দেখে নিয়ে বলল, ‘আমি

ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে এত টেনশন হচ্ছিল। আপনি ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন, তা তো বুঝতে পারছিলাম না। তাই...'

আমি বললাম, 'তোমার কোন ক্লাস? টেন?'

'হ্যাঁ,' ঋতি মাথা নাড়ল, 'স্টেট হয়ে গিয়েছে। সামনে মাধ্যমিক।'

আমি মাথা নাড়লাম। মনে হল, এরপর কী বলব?

কিন্তু ভদ্রমহিলা ব্যাপারটা সহজ করে দিলেন। বললেন, 'তুমি পাশের ঘরে এসো রুকু। উনি ওখানেই আছেন।'

আমি চোখ বন্ধ করলাম একটু সময়ের জন্য। গলার কাছটা বাখা করছে। কিন্তু নিজেকে সংযত করতেই হবে।

'এসো।'

এই সন্ধ্যাত্তেও খোলানো রয়েছে শাড়ি কেটে তৈরি করা পরদা। সেটা সরিয়ে ঢুকলাম আমি। এই ঘরটাও পাশেরটার মতোই। তবে আসবাব একটু বেশি। কিন্তু সেদিকে চোখ গেল না আমার। আমি দ্বির হয়ে তাকিয়ে রইলাম বিছানার দিকে।

জানালার দিকে বিকেলের হালকা আলো এসে পড়েছে বিছানায়। তার ভিতরে গিয়ে কবল দিয়ে শুয়ে রয়েছে বাবা।

আমার চোখে জল এল। মনে পড়ল ছোটবেলায় এমনই শীতকালে রুমের দুপুরে বাবার সঙ্গে কবলের ভিতরে শুয়ে থাকতাম আমি।

'বাবু,' বাবা দুর্বল গলায় ডাকল আমায়।

আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম বাটার পাশের মোড়টায়। বাবা হাত বাড়ালে কবলের তলা থেকে। আমি ধরলাম হাতটা। রোগা, ঠাণ্ডা, কুঁড়ে লাগে বাওয়া একটা হাত।

দেখলাম, বাবার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

'ঋতি, ওঁদের কথা বলতে দে। ও ঘরে চলে।'

আমি বললাম, 'না, অপনোয়াও থাকুন। ঋতি আমায় ই-মেল করেছিল। বলেছিল, খুব সমস্যায়ে আছেন আপনারা। আমি আসতে পারিনি আগে। কয়েকদিন হল ককতায় এসেছি। আমার খুব তড়াতাড়ি ফিরেও যাব। কিন্তু মাওয়ার আগে একবার দেখা করতে এলাম। আসলে জানি না আমার কবে ফিরবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি চা বাও তো? কি?'

'না, মিষ্টি,' আমি বারণ করলাম, 'আমি চা, কফি কিছুই খাই না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

বাবা হাতে চাপ দিল আমার, 'কেমন আছিস বাবু?'

কেমন আছি আমি? সব ছেড়ে একা গ্রামের বাইরে কেমন থাকে মানুষ? অঙ্ককারের মধ্যে গুটিয়ে একমাথা অচল খুঁটো পরসার মতো স্মৃতি নিয়ে কেমন থাকে মানুষ? চন্দন আর চিত্রা কাঠের মধ্যে পার্থক্য লোপ পায় যখন, তখন কেমন থাকে মানুষ? আদৌ সে কি মানুষ থাকে আর? আমি মাথা নিচু করলাম। আমার গলার ব্যাটা বেড়েছে খুব। যেন পাখর আটকে আছে। কথা বলতে পারছি না।

বাবা বলল, 'আমি তোর জন্য কিছু করতে পারলাম না। ঋতিটার জন্যও পারিনি। নিজের সুখের জন্য আমি সবাইকে...'

'বাবা থাক,' আমি কথাটা শেষ করতে দিলাম না বাবাকে।

বললাম, 'আমি এসেছি একটা কথা বলতে। কিছু টাকা আমি ঋতির জন্য ফিল্ম করে দিয়ে যাব। সেটা ওর পরের দরকার লাগবে। আর...'

'সে কী? তুমি কেন টাকা দেবে? ঋতি মা বলে উঠলেন।

আমি বললাম, 'আমার বোন বলে। দশ বছরে আমি আসতে পারিনি। এবার যখন এসেছি তখন আমার ইচ্ছে করছে ওকে কিছু দিতে। আপনি চাই 'না' করবেন না। আমি আরও কিছু করতে চাই ওর জন্য। কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক কী করব। যাই হোক, ওর ব্যাচ অ্যাকাউন্ট আছে তো?'

বাবা বলল, 'জানি বাবু, তুই আমায় কমা করবি না। কিন্তু বিশ্বাস কর আমি তোরা মায়ের ব্যাপারে...'

'ওসব থাক বাবা,' আমি ঋতির দিকে তাকালাম, 'কী? তোমার অ্যাকাউন্ট আছে?'

ঋতি মাথা নাড়ল, 'আছে।'

আমি ব্যাণ থেকে একটা কার্ড বের করে ওকে দিয়ে বললাম, 'এটা আমার যোগাযোগের ঠিকানা। যখনই কোনও দরকার পড়বে, আমায় বলবে। কেমন? সংকোচ করবে না।'

'বাবু তুই...' বাবা আমায় কিছু বলতে গেল।

আমি আর পারলাম না। বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শোনো বাবা, আমি তোমাকে ছোট থেকে খুব ভালবেসেছি। মায়ের চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালবেসেছি হতো। তাই তুমি যা করবে তাতে তোমায় কোনওদিনও কমা করতে পারব না। কোনওদিনও না। কিন্তু ঋতি তো মোহ নেই কোনও। ওকে আমি সাধ্যমতো সাপোর্ট করব। তুমি আমার সঙ্গে অন্যায় করতে পারো, কিন্তু আমি সেটা পারি না। কারণ, তুমি আমায় ভাল না বাসলেও আমি আজও তোমায় সেই ছোটবেলার মতোই ভালবাসি।'

ওখান থেকে বেরিয়ে টুকটাক কিছু কেনাকাটা করে পাড়ায় ঢুকতে-ঢুকতে সন্ধ্যার দিকে গড়িয়ে গেল। আমি ডাবলাম বাড়ি গিয়ে একটু সেটে বসব। ইউনিভার্সিটিতে বস কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা করতে চেয়েছেন।

বেশম মন নিয়ে আমি সোনারপুর গিয়েছিলাম, ওখানে ষ্টাডিয়েক সময় কাটানোর পর কিন্তু আর তেমন খারাপ লাগছে না। যা হয়ে গিয়েছে তা তো আর আমি পালটাতে পারব না। তার চেয়ে এই ভাল। তা ছাড়া খতি খুব ভাল মেয়ে। যা কিছু খারাপ হয়েছে তার মধ্যে থেকে যদি কিছু বেরিয়ে থাকে, তা হল এই মেয়েটা।

আমি ভেবেছি ফেরার আগে আর-একবার যাব ওখানে। কারণ, একটা কাজ এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। ওখানে থাকতে থাকতেই সেটা সমাধাৎ এসেছে।

জিন্দগী।

সাপেলের গলার স্বরে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, একা শীতল নয়, ওর পাশে তোশানাও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমার গলা শুকিয়ে এল। কী আশ্চর্য। এত বছর কেটে গিয়েছে, এত কিছু হয়ে গিয়েছে, তা-ও তোশানাকে দেখে আমার এখনও কেন এমন হয়? কেন মনে হয় সারা শরীরে আড়াই লক্ষ কিব্বি ডাকছে একসঙ্গে।

পাড়ার এই জায়গাটার দুটো বড় বাড়তিম গাছ আছে। ফলে স্ট্রিট লাইটের আলো খুব একটা আসে না।

'তোমার তড়াতাড়ি আছে? শীতল জিজ্ঞেস করল।

'কেন?' আমি এগিয়ে গেলাম ওদের কাছে।

শীতল বলল, 'এমনি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হল। তাই।'

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না।

তোশানা বলল, 'আমি আসি।'

'কেন?' আমি বলতে চাইনি কথাটা। কিন্তু কী করে যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

তোশানা তাকাল আমার দিকে, 'তোমায় কৈফিয়ত দেব?'

আমি থমকে গেলাম। মেয়েটা সব সময় এমন কেন করে আমার সঙ্গে এত মেজাজের কী আছে? আমি কী করছি ওর? একটা ফালতু ধারণা নিয়ে বসে রয়েছে। করে কী ভুল বুঝেছে তার জের এখনও চানছে।

আমি বললাম, 'ডোন্ট বি সো রুড। আমি কী করছি তোমার? লজ্জা করছে না তোমার? কী করছে জানতে চাইছি? তোশানা ফোঁস করে উঠল।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, জানতে চাইছি। আজ বলেই দাও কী করছি। আমারও রাগ বলে একটা জিনিস আছে কিন্তু। জীবনের সব জায়গায় মার খাব নাহি। আমি কী করছি আমি? যা করছে তুমি করবে। যখন সুবিধে হয়েছে এসেছ, তারপর যখন দেখেছ হাওয়া খারাপ, সরে গিয়েছ। আর তুমি আমার অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছ?'

আবছা আলোতেও বুঝলাম তোশানার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে।
ছোট্ট চোঁট কাঁপছে তিরতির করে। মনে হচ্ছে যে-কোনও সময়
ফেটে পড়বে বিস্ফোরণে। শীতলের মুখে অপ্রস্তুত ভাব। ডেকে কথা
বলতে গিয়ে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা তো হতই। আজ না
হলে কাল এখনটা তো হওয়ারই ছিল। তোশানা আমায় দেখলেই
এমন মুখ করে যে, সেটা সব সময় সফল করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
আমি আমার বললাম, “আমার ফেলছে গিটে তো এক সেকেন্ড
সময় নাওনি। সেটা মনে আছে কি?”

তোশানা ধরখর করে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, “ভুলে গিয়েছ, তুমি
সব ভুলে গিয়েছ। মনে আছে কী জিজ্ঞেস করেছিলাম তোমায়? মনে
আছে?”

॥ ২ ॥

‘আমায় ভালবাসো তো তুমি? সত্যিকারে ভালবাসো তো?’
তোশানা ডাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বলল, ‘তোমার উত্তরের
উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে রকু। ভাল করে তেবে উত্তরটা দাও।’
ভাবব, কী ভাল করে ভাবব। ভাল করে ভাবার মতো মনের
অবস্থা কি আছে আমার? আমি তাকলাম তোশানার দিকে।

আজ দশমী। সরি এসে গিয়েছে পাড়ায়, রাতে ঠাকুর ভাসানের
জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তার আগে শেষ পূজার আনন্দ করে
নিচ্ছে সবাই। প্যাণ্ডেলের সামনে ছোট ছোট জলশায় ডাগ হয়ে গল্প
চলছে। ছবি তোলা চলছে। সবাই হাসছে। আমাকাপড় বয়লমাসে
সবায়। পাড়ার রাস্তাটা ছোট-ছোট আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে।
রাতের অন্ধকার বলে আর কিছু নেই এই কলকাতায়। কিন্তু চারদিকের
এই আলোর মধ্যে আমি নিচ্ছে ব্র্যাক হোল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
কোনও কিছুই আমার মনখারাপের আকর্ষণ ছাড়িয়ে বেরোতে পারছে
না। সব কিছু আমার কাছে মূর্ত্তায় থরা বালির মতো মনে হচ্ছে। এই
জীবন নিয়ে আমি এরপর কোন দিকে যাব? কী করব? দিনের বেলায়
কোথাও বসতে পারছি না শাড়িতে। খেতে পারছি না। রাতের বেলায়
চোখ বন্ধ করলেই সামনে ভেসে উঠছে সেই মূর্ত্তা। এ আমার বিনি!
সব বোনে। সত্যি। আমার বাবার আর-একটা সৎসার আছে। সেখানে
ছ’বছরের মেয়ে আছে বাবার? এত দিন আমাদের কাছ থেকে এটা
জুকিয়ে রেখেছে। কাজের নাম করে তাহলে ওই মহিলার কাছে সময়
কটায় বাবা? এতদিন ধরে আমাদের বোকা বানিয়ে এসেছে। সুযোগ
নিয়মে। আমার মনে হচ্ছে আমার মাখার ওপর থেকে আকাশ আর
পায়ের তলার থেকে মাটি সরে গিয়েছে। জীবনে বাবা ব্যাপারটার
গুরুত্ব যে কতটা, সেটা যেন আজ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি।

আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সেদিনের ঘটনাটা। ছোট থেকেই
সবাই বলে আমি আমার বাবার মতো চোখ পেয়েছি। বড়, টানা টানা।
তাই সেদিন রক্তা খুলে বেরিয়ে আসা ওই ছোট্ট মেয়েটার মূর্ত্তা চোখ
দেখে আমি এক লহমায় বুকে গিয়েছিলাম মায়েসে আদম্বাই সত্যি।
বুকে গিয়েছিলাম আমি কতটা বোকা। আমাকে কী সহজেই অন্ধ করে
রাখা যায়। আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, কাল বসতে
পারছিলাম না। বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সামনের দিকে
তাকিয়ে। মনে হচ্ছিল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি।

‘এসো রকু, ঘরে এসো,’ পিছনে এসে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা আমায়
ডেকেছিলেন এবার।

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ইনি আমায় চেনেন!
কীভাবে চিনলেন? কে বলেছে আমার কথা? আমার চোঁট শুকিয়ে
গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মূর্ত্তার সঙ্গে কেউ জিভটা পেরেক দিয়ে গেঁথে
গিয়েছে। পা কাঁপছিল আমার। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। আমি কি
যাব ভিতরে?

এবার ছোট্ট মেয়েটা এসে হাত ধরেছিল আমার। আলতোভাবে
টেনে বলেছিল, “এসো, মা বলছে তো আসতে। এসো।”

আমার কি যাওয়া উচিত? আমি বুঝতে পারিনি। যেন নিশিতে
ডাকা মানুষ আমি। যেন নিজের মন বলে আর কিছুই নেই। যেন মন
ছিলই না কোনওদিন।

আমি পায়ে-পায়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।
ছোট্ট ঘর। সামান্য আসবাব। কিন্তু খুব পরিভাষ। আমি চারদিক
তাকিয়েছিলাম। কিন্তু বারবার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল চোখ।

‘তুমি কাঁদছ কেন?’ ছোট্ট মেয়েটি এসে হাত ধরেছিল আমার।
আমি তাকিয়েছিলাম ওর দিকে। একমাথা কোঁকড়া চুল, বড়-বড়
চোখ। বিশিষ্ট হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি আমার হাতায়
চোখ মুছেছিলাম।

ভদ্রমহিলা একটা প্লাস্টিকের চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলেছিল,
‘বাসো বাবা। তুমি এমন করে আসবে... মনে আমি... ঠিক...’

আমার কথাই বেরছিল না কোনও।

উনি বলেছিল, ‘তোমার বাবা আমায় বলেছে তোমাদের কথা।
আমি জানি। কিন্তু তোমরা বোধ হয়... আমি খুব লজ্জিত। কিন্তু এমন
বিপদে পড়েছিলাম যে, তোমার বাবা সাহায্য না করলে... তারপর কী
যে হল। আমি বমোছিলাম ঐকে আমায় ছেড়ে যেতে। উনি জানি।
তখন খতি আমার পেটে। আমিও ভয় পেয়ে যাই... মানে ঠিক
বোকাতে পারছি না বোধ হয়। কিন্তু এমন সব খেঁটে গেল। তারপর
ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাব? উনি এখানে রাখলেন। আমি
আসতে বাধ্য করি। জানি, তোমাদের প্রতি আমি খুব অন্যায
করেছি... কিন্তু আমি কীভাবে বাঁচব বুঝিনি। আমি হয়তো স্বার্থপর।
কিন্তু ছোট্ট মেয়েটার... তুমি রাগ কোরো না। আমি... আমি...’

উনি আরও কিছু বলেছিলেন, কিন্তু আমার কোন কোনও কথা
চুকছিল না। সারা ঘরটা বনবন করে ঘুরছিল যেন। গা শুশোলিল
আমায়... আমি তাকিয়ে দেখছিলাম ছোট্ট মেয়েটাকে। এর নাম খতি।
এ ছাঁমের বোন। আমার একটা বোন আছে, সেটা এই চকিল বছর
যুগে এসে জানলাম। এটা কোন জীবনে আছি আমি? কী কোন
স্বাভিলাশে এমন একটা জীবন পেলাম। এই কথা শুনেসে মা কী
করবে?

আমি মাঝা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম সামান্য সময়। তারপর
কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এসেছিলাম রাস্তায়। শুধু আসার সময়
দেখেছিলাম আমার ছলছলে চোখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে
রয়েছে খতি।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি কিছু দূরে গিয়ে দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিলাম।
গোটা শহরটা যেন উলটে গিয়েছিল আমার সামনে। মনে হচ্ছিল বাস,
ঢালি, অটো, মানুষজন একুনি বোধ হয় বৃষ্টির মতো খসে পড়বে
আকাশ থেকে। একুনি সব ওলটপালট হয়ে যাবে। একটা দলা
পাকানো শহর যেন ডেড়ে আসছিল আমার দিকে।

আমি পেটে চেপে রাস্তায় বসে ওয়াক বসে তুলে বমি করে
ফেলেছিলাম। দু’-একজন এসে দাঁড়িয়েছিল পাশে। একজন সোকান
থেকে জলের বোতল এনে ছিটকে গিয়েছিল চোখদুখে। কেউ
বলছিল, শরীর খারাপ? কেউ জিজ্ঞেস করছিল কোনও বিপদ হয়েছে
কি না। আবার কেউ বলছিল, সাতসকালেই আমি দম পেয়েছি বোধ
হয়।

আমি সময় নিয়েছিলাম একটু। তারপর উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। শুধু
মনে হচ্ছিল মাকে গিয়ে কী বলব আমি? কীভাবে বলব যে, বাবার
আর-একটা ওলট আছে। একটা ছ’বছরের মেয়ে আছে। যে-মানুষটার
সব জানি বলে আমায় এতদিন ভাবতাম, তার জীবনের আর-একটা
মিক আছে। যে-চাঁদ আকাশে দেখে আমরা অভ্যস্ত, তার অন্ধকার
আর-একটা মিক আছে। কী করে মাকে বলব বাবার ‘ডার্ক সাইড অব
দ্য মুন’-এর কথা।

আমার মনে কোনও কথা আসছিল না। শুধু ‘বো’ শব্দ সব কিছু
ঢেকে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল এই শহর থেকে পাগিয়ে যাই। সব
ছেড়ে, সব পিছনে ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। তারপর দূরে, বহুদূরে

কোনও গ্রামে, ভোরবেলা কোনও ছোট্ট চায়ের সোকানে বসে দেখি, বহরের কাগজে নিজের সাদা-কালো ছবি। পড়ি সন্ধান জানানোর ঠিকানা।

একটা-একটা করে স্টেশন পেরোচ্ছিল 'মটো'। আমার শরীরের মধ্যেও যেন শুল ঢুকছিল একটু-একটু করে। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় চিংগের করছিলাম। কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছিল না সেই শব্দ। আমি দেখেছিলাম, আমার পাশে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে কানে ইয়ার ফোন ঝুঞ্জে গান শুনেছে। দূরে দাঁড়ানো চারটে মেয়ে হাতে প্রচুর শপিং-ব্যাগ ফুলিয়ে প্রচণ্ড হাসছে। আর-এক দিকে একজন বয়স্ক লোক বই পড়ছে। আমার অবাক লাগছিল, ওরা কি কেউ আমার চিংগের শুনতে পাচ্ছে না? এই যে আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। কান দিয়ে রক্ত পড়ছে। এর কিছুই কি ওরা বুঝতে পারছে না? নাকি ওরাও 'বো' ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না? আমার মতো।

সেদিন রাত্তাগুলো ছিল নির্জন। কোনও লোক দেখা যাক্ষিল না। শুননা ফুটপাথে আমি হটছিলাম বাড়ির দিকে। আমার ছায়া আমার ছেড়ে মাঝে-মাঝেই পিছিয়ে পড়ছিল, মাঝে-মাঝে এগিটেও যাক্ষিল অন্যানমনস্ত হয়ে।

আমি দেখছিলাম, গাছে একটা পাতাও নেই। শুধু বৃক্ষদের শিরা-উপশিরা জাগা হাতের মতো মৃত গাছদের ভালপালা ছড়িয়ে রয়েছে আকাশের শরীরে। পাখিদের সমস্ত পালক সেদিন তুলোর মতো ঝরে পড়ছিল আকাশ থেকে। সেদিন মেঘ ছিল না, রোদ ছিল না, সূর্য ছিল না, এমনকী আকাশের নীল রঙটাও ছিল না কোথাও।

আমি হটছিলাম আর দেখছিলাম দু'পাশের ঘুমন্ত বাড়িঘর, বেষুনি হয়ে থাকা সিগনালের আলো আর মোড়ের মাথায় শুধু ট্র্যাফিক পুলিশের হেলমেট পড়ে রয়েছে পথে। আমি বাড়ির পথ ঝুঞ্জে পাচ্ছিলাম না। সব গলিগুলো কে যেন লাল রঙে ঢুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। প্রতিটা গলির মুখে কে যেন পুঁতে দিয়েছিল একই রকম দেখতে কাকতাত্ত্ব্য।

মনে হচ্ছিল কোথায় হটছি আমি? কার কাছে যেন যেতে হবে। আটো কি যেতেই হবে? কী বলব গিয়ে? গিয়ে বলব, মা, আমি চাইনি অজ্ঞকার পিতৃ জানি; বলব, জানি, আমার বাবা বলে জানা দেখকটা আসলে আমার বাবাই নয়।

মা দাঁড়িয়েছিল রাস্তাঘরে। হাতে মশলার কৌটো। সামনের কড়াইয়ে তেল ফুটছিল। তার টিটিপট শব্দ শিপড়ের মতো হেঁটে বেড়াছিল গোটা বাড়িতে। আমি জুতোটা বাইরে খুলে ঢুকছিলাম ঘরে। তারপর টলমলে পায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমার সামনে।

মা তাকিয়েছিল আমার দিকে। আমি কিন্তু তাকাতে পারিনি। মাথা নামিয়ে নিয়েছিলাম ধীরে-ধীরে। মা একটা স্ট্রেট এগিয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, 'দেখ তুই, তরকারিডে নুনা ঠিক আছে কি না!'

আমার হাত কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল, চিনেমাটির স্ট্রেট পড়ে যাবে হাত থেকে। তা-ও নিয়েছিলাম।

মা শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন দেখতে?' আমি উত্তর দিতে পারিনি।

মা আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর কেউ আছে? মানে...'

'মেয়ে,' আমি পারদ ভর্তি মাথাটা তুলেছিলাম এবার, 'হ'বছর যমস।'

'ও!' মা হাতের মশলার কৌটোটা রেখেছিল পাশের টেবিলে।

তারপর ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গিয়েছিল রাস্তাঘর থেকে।

আমি দাঁড়িয়েই ছিলাম। হাতে স্ট্রেট। তরকারিটি আর খেয়ে দেখিনি। কারণ, জানি নুন ঠিক নেই।

সারা দুপুর আমি নিজের ঘরে শুয়েছিলাম। শুয়ে থাকতে-থাকতে ঘুম এলে গিয়েছিল কখন। বন্ধে দেখেছিলাম একটা পেওয়াল। নীল রঙের লম্বা একটা পেওয়াল। আর তার মাথায় ছোট্ট গোলাপি একছোড়া মেয়েদের জুতো রাখা আছে।

বাবা এসেছিল রাতের বেলা। খেতে বসে বলেছিল, 'আমায় কাল বেরতে হবে। অফিসের কাজ আছে। পুছোর পর ফিরব।'

আমি আর পারিনি। একটা ক্লটি নিয়ে বসেছিলাম শুধু। খাবার গিলতে পারছিলাম না একটুও। তারই মধ্যে এই শেষের কথাটা শুনে ছিটকে উঠেছিলাম এবার, 'কোথায় যাবে আমি জানি। ঋতিকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে। তাই তো?'

বাবা চমকে উঠেছিল আমার কথায়। হাত থেকে তিন কোনো ক্লটি ঢুকুরো পড়ে গিয়েছিল খালায়। বাবা বস্ত্রের মতো তাকিয়েছিল মায়ের দিকে।

মা ডালের মধ্যে হাতা ঢুবিয়ে বসেছিল হটুতে মুখ রেখে। অদ্ভুত ঠাণ্ডা দৃষ্টি। শান্ত মুখ। যেন কিছুই হয়নি।

আমি বলেছিলাম, 'তুমি মানুষ? মানুষ তুমি? সাতা? খেল জানি। কোনওদিন কিছু বপিনি তাই নিয়ে। মাকে অবহেলা করে জানি। তা-ও কিছু বলিনি। কিন্তু আর-একটা বিয়ে! হ'বছরের মেয়ে! তুমি বাপ না জানোয়ার?'

বাবা কিছু বলতে পারছিল না। আমি রাগের চোটে তরকারির বাটিটা ছুড়ে মেরেছিলাম কাঠের দরজায়। বাটিটা দরজায় লেগে ছিটকে গিয়েছিল মায়ের দিকে। মা তা-ও নড়েনি।

ঠাকুরা আমার চিংগের শুনে পৌছে এসেছিল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, 'হোটেলোকের মতো টেঁচাচ্ছিল কেন তুই?'

আমি যেন দেখেছিলাম ঠাকুরার চোখ নেই। চোখের পাতা দুটো সেলাই করে। আমার মনে হয়েছিল আমি কি স্বপ্ন দেখছি। এসব কি সত্যি হচ্ছে?

বাবা উঠে দাঁড়িয়েছিল এবার। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমি চলে গেলাম। আর আসব না।'

মা-তাকিয়েছিল শুধু। তারপর ক্লান্ত গলায় বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে ময়নি পাগিয়ে এসেছিলাম, সেদিন রাতে আমার বাবা নাকি খুব কৈসেছিল। আমায় সবচেয়ে ভালবাসত তো। তারপর বাবা দশদিন ভাল করে বায়নি। কথা বলেনি কারও সঙ্গে। সারাক্ষণ নাকি আমার ছবি নিয়ে বসে থাকত। তা-ও জানি, আমি ভুল করিনি। আমি তো ভালবাসেছি তোমায়। কিন্তু তুমি পারোনি বাসতে। সেটা তোমার হার। যাও!'

বাবা আর দাঁড়ায়নি। মা-ও ধীরে-ধীরে উঠে গিয়েছিল ভিতরে। আর আমি একা বাওয়ার ঘরে বসেছিলাম লম্বভভ একটা রাত নিয়ে। শুনছিলাম পাড়ার ছেলেরা হুলা করছে। লরি ঢুকছে। মায়ের মৃত্যু এসেছে প্যাডেলে।

আজ দশমী। রাতে ঠাকুর ভাসান যাবে। গত ক'দিন আমি নিজের ঘর থেকেই বেরোইনি প্রায়। কিন্তু একটু আগে শীতল আমায় ডেকে এনেছে প্যাডেলে। আমি আসতে চাইনি। কিন্তু শীতল বলেছে না গেলে তোশানা নাকি খুব খুব কষ্ট পাবে।

প্যাডেলের পিননের দিকে আবছাছায় এখন তোশানা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার সঙ্গে।

'আমায় ভালবাসো তো তুমি? সত্যিকারে ভালবাসো তো?'

তোশানা তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বলল, 'তোমার উত্তরের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে রুকু। ভাল করে ডেবে উত্তরটা দাও।'

ডাবব। কী ভাল করে ডাবব আমি।

তোশানা বলল, 'আমি জানি তোমার বাড়িতে কী হয়েছে। সারা পাড়া জেনে গিয়েছে। আমার মা-ও জানে। বৃকতে পারছ ব্যাপারটা? কী হল, আমায় ভালবাসো তো রুকু? সত্যি ভালবাসো তো?'

আমি তাকালাম তোশানার দিকে। সাদা-কালো ছবির মধ্যে গিয়ে লাগছে ওকে।

'আমার মা এমনভেই তোমায় পছন্দ করে না। এতে আরও কথা বলার সুযোগ পেয়ে গিয়েছে মা। তুমি আমায় বলে, ভালবাস কি না।

আমি তা হলে সব ছেড়ে তোমার কাছে আসব। দু'জন তোমার মায়ের সঙ্গে থাকব। তুমি একবার বলা রুকু। এটা আমি জানতে চাই। এটা জানা দরকার! বলে!।' তোশানা দু'হাত ধরে ঝাঁকাল আমায়।

আমার ভিতরে ভরা বর্ষার ঝিলটা এবার চলকে গেল। চোখের কোণ দিয়ে এক ফোটা দু'ফোটা জল নেমে এসে অন্ধকারে। তোশানা তাকাল আমার দিকে। তারপর আলতো করে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়। বলল, 'আমি বুকেছি। আমি আছি রুকু। তোমার সঙ্গে আছি, সারা জীবন।'

'দাদাভাই, দাদাভাই।' আচমকা পিছন থেকে বিলুর গলা শুনলাম আমি।

ওর ডাকের মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, আমি দ্রুত তোশানাকে সরিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়লাম। দেখলাম, বিলু হাঁপাচ্ছে। আবছা অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছে বুব ভয় পেয়ে গিয়েছে।

আমি চোখ মুছে বললাম, 'কী হয়েছে বিলু?'

বিলু চৈতন্যে বলল, 'তোর মোবাইল কোথায়? কাছে রাখিস না কেন?'

'কী হয়েছে?'

'জ্যেতিমা, জ্যেতিমা, জ্যেতিমা...' বিলু বলতে-বলতে ডেঙেচুরে বসে পড়ল রাস্তায়।

মা।

বাবার সঙ্গে মা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার পর মায়ের বাবা, মানে আমার দাদু দশ দিন ভাল করে কথা বলেনি কারও সঙ্গে। ভাল করে খায়নি। ভাল করে ঘুমোয়নি। শুধু মায়ের ছবি দু'হাতে ধরে বসেছিল। তারপর এগারো দিনের মাথায় ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে দিয়েছিল নিজের কবজির শিরা কাটা দুটো হাত।

আট

আমার মা নিজের দু'হাতের কবজির শিরা কেটে ডুবিয়ে দিয়েছিল গরম জলের ভিতর। আমি যে-সময় বাড়ির বাইরে গিয়েছিলাম, সেই সময়টুকুর ফাঁকটাই চলে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিল মা।

আমি সামনে টাঙানো মায়ের ছবিটা দেখলাম। মায়ের গুঁড়ু বখসের ছবি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছে। এই মা আমার ছোটবেলার মা, বড়বেলার মা নয়।

এখন বিকেল। আমার শরীরটা ভাল নেই আজ। সামান্য ঝ্বর হয়েছে। তাই আর বেরোইনি সারাদিন। সামনে ল্যাপটপে একটা মুভি চলেছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, দেখতে হচ্ছে করছে না। আমার মনের ভিতরে খালি সেদিন তোশানার কথাগুলো ঘুরছে।

সেই বহুবছর আগের দশমীর রাত্তি তোশানা আমায় যা জিজ্ঞেস করেছিল তার উত্তরটা ও কি জানত না? না জেনেই কি বলেছিল যে ও বুকেছে? না জেনেই কি বলেছিল সারা জীবন আমার সঙ্গে ও আছে?

আমি বাগিসে মাথা রেখে শুলাম। কলকাতায় ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। তবে আমার লেপটপের দরকার হয় না। পাডলা একটা বেশ গায়ে দিলেই আমার হয়ে যায়।

মোবাইলটা দেখলাম। আজ দুপুরে শীতল মেসেজ করেছে একটা। সেদিন তোশানার ব্যবহারের জন্য 'সরি' বলেছে। কিন্তু সেখানেই খেমে থাকেনি। বলেছে, ওর মনে হয় তোশানা এখনও নাকি আমাকে...

আমি আর পুরো মেসেজটা পড়িনি। এসব পড়ে কী হবে? সেদিন তোশানা এই প্রস্তুত করেই এগুট করে চলে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার ও এক্সপার্ট। আগেও তোশানা তো নিজেকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল আমায়। আমি চোঁড়া করেও আঁটকোতে পারিনি। তারপর আমারও আর কোনও সম্পর্ক হয়নি। অনেক কোনওদিন মনেই হয়নি এসব। আমি আমার পড়াশোনা আর কাজ নিয়েই সময় কাটিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু আজ এই শূন্য ঘরে, শেষ বিকেলের আলোয় শুয়ে আমার মনটা এমন যেন ভারী হয়ে আছে। কোনও কারণ নেই, কিন্তু অভিমানে জল আসছে চোখে। মনে হচ্ছে আমার তবে কেউ নেই? আমি তো সবাইকেই ভালবেসেছিলাম, সবার জন্যই চিন্তা করেছি, সবাইকেই ভাল করে রাখতে চেয়েছি। তবে! তবে আজ আমি এমন একা কেন?

আমি হাত বাড়িয়ে ল্যাপটপের স্ক্রিনটা বন্ধ করে দিলাম। ডাবলাম, একটু ঘুমে। জেগে থাকলেই ভুলভাল চিন্তা আসে। মানুষের মনখারাপে এত হাজার-হাজার ছিন্ন থাকে যে, কোন ফুটো দিয়ে কে চুকে পড়ে তা বোঝানো যায় না।

আমি ল্যাপটপটা বিছানার পাশের টেবিলে তুলে রাখলাম। তারপর খেঁশটা ভাল করে টেনে শুতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। দরজায় ঝটঝট করে শব্দ হল একটা।

আবার কে। আমি বললাম, 'কে? দরজা খোলা আছে।'

ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল বিলু।

আমি উঠে বাটের হেডবোর্ডে হেলান দিয়ে বসলাম, 'কী রে?

কলেজ যাসনি?'

বিলু এসে বসল আমার পায়ের কাছে। তারপর চুলটাকে একটা হর্স টেল করে শুকিয়ে বলল, 'চলে এসেছি কলেজ থেকে। তোর ঝুর?'

আমি মাথা নাড়লাম।

বিলু বলল, 'খেরেছিস দুপুরে? আর ওহুধ?'

'নাঃ, ওহুধ বাহিনি। সঙ্গেবেলা ডাক্তার দেখাব। তা, তুই কিছু বলবি?'

বিলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমি তোকে দেখতেই আসছিলাম। তো, পুরো আমায় একটা কথা বলে দিতে বলল, সত্যি! বাবাটা যা হয়ে গিয়েছে না।'

'কেন কী হল আবার?'

বিলু পা দুটো বিছানায় তুলে বাবু হয়ে বসে বলল, 'পুজা আসবে আজ তোর সঙ্গে সেবা করতে। তুই যেন কোথাও বেরিয়ে না যাস। সেটা বলতে বলল।'

আমি অবাক হলাম। পুজা। মানে সেই মেয়েটা। এখানে আসবে কেন? আর ব্যাপারটা তো আমাকেও মেসেজ করে জানাতে পারত। আমার কাছ থেকে তো ও মোবাইল নবর নিয়েছিল।

বললাম, 'ইঠাঃ ওই মেয়েটা আসবে কেন?'

'আমি জানি না। বাবা যে কী করছে ভগবান জানে।' বিলু কথটা বলে একটু ধামল। যেন সময় নিল। তারপর বলল, 'দাদাভাই, আমার সঙ্গে গতকাল শীতলের কথা হয়েছে।'

'কী? আমি অবাক হলাম। বিলু আচমকা এটা বলল কেন?'

'শীতল আমায় বলেছে ব্যাপারটা।'

আমি মাথা নিচু করলাম। আমি নিজের এইসব ব্যাপার কারও সঙ্গে আলোচনা করতে পারি না। ভাল লাগে না।

'দাদাভাই,' বিলু বলল, 'তোশানাদি সেদিন বাড়ি গিয়ে খুব কান্নাকাতি করেছে। খুব কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা।'

আমি বললাম, 'বিলু, তুই আমার সঙ্গে এইসব নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটু আভার এজ হয়ে যাচ্চিস না?'

'মানে? বিলু ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে, 'আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি দাদাভাই! আর তোর সব ঘটনাই তো আমি জানি। তোশানাদি তোকে যে ভালবাসে এখনও বুঝিস না? কেন তোর ওপর রাগ দেখায় বুঝিস না?'

'না, বুঝি না,' আমি চোয়াল শক্ত করলাম, 'পুরনো কথা আমি তুলে যাইনি বিলু। ও আমায় তুল বুঝে ছেড়ে যেতে এক সেকেন্ড সময় দেয়নি। তারপর বাড়ির ঠিক করে পেওয়া পাত্রের সঙ্গে এ ড্যাঙড্যাঙ করে বিয়ে করে নিয়েছে। যাক, যা করছে ভাল করছে। ওর জীবন ও কার সঙ্গে কাটাতে তা ওর ব্যাপার। আমি যে বাতিল,

সেটা মেনে নিয়েছি।'

'তুই ব্যাপারটা বোঝ,' বিলু চারদেওর ওপর দিয়ে আমার পা-টা ধরে বলল, 'তোশানামিকে কোথায় নিয়ে দেয়। তোর উপর তখন রেগে ছিল তোশানামি। তাই বিয়েও করে নিয়েছিল। কিন্তু জানিস তো বিয়েতে কী হল? ওর স্বপ্তরমশাই লোকটা কী ডায়বলিক জানিস তো? ওকে... ওকে ওর স্বপ্তর...'

'থাক বিলু, ওসব বাব দে,' আমার বুকের ভিতরটা রাগে, হিংসের মুচড়ে উঠল।

'ওর ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে বলে... ও আর আগের মতো ভার্জিন...'

'বিলু,' আমি ধমক দিলাম, 'এবার বেশি বলছিস। তোরের কিউপিড হতে কে বলেছে? আমি বলেছি? আমি বলেছি আমার জীবনে কাউকে দরকার?'

বিলু বলল, 'কেউ বলেনি দাদাভাই। কিন্তু শীতল তো তোশানামিকে রোজ দেখে। তুই এখানে আসার পর থেকে সি ইউ বিহেভিং স্ট্রেন্জলি: আর সেই দিনের পর তো খুব ভেঙে পড়েছি।'

'দেখ বিলু, ও-ই যা বলার বলেছে আমায়। আমি কিন্তু রিট্যাগিলিটে করিনি। আর তোরাই কী চাস?'

'তোকে বলেছিলাম মনে আছে দাদাভাই, আয়াম সাকার ফর হ্যাপি এন্ডিং: মনে আছে? বিলু উঠে পড়ল, 'যেখানে ঘুম ভাঙে সেখানেই সকাল দাদাভাই। এভাবে থাকিস না। সহজ জিনিসটাকে কমপ্লিকটেড করিস না।'

আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করলাম। সেই ছোট বিলু কত বড় হয়ে গিয়েছে। আমার হাসি গেল হঠাৎ।

বিলু দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ঘুরে বলল, 'অন্তত একবার কথা বল তোশানামির সঙ্গে একা-একা। জানিস তো তোশানামি খুব অভিমাত্রী। একবার বল।'

আমি হেসে বললাম, 'আহরুখ খানের নতুন ছবি কিছু আসছে না, না? আমায় নিয়ে পড়েছিস।'

বিলু রাগের ভঙ্গি করে দরজা খুলল বেরোবে বলে, কিন্তু থমকে গেল। কাউকে দেখে মুখটা পালটে গেল ওর। আমি কে এসেছি দেখার জন্য উঠলাম বিছানা থেকে। আর তারপর যামের হেঁচলাম, তাতে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। আরে ওরা! এমনভাবে খবর না দিয়ে?

দেখলাম, ঘরের বাইরের ল্যান্ডিংটা দিয়ে রয়েছে পেরেক। সঙ্গে রোগাশতো একজন ডব্লোক।

বিলু অবাক হয়ে একবার পেরেককে দেখল, আর-একবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে। তারপর ওদের পাশ কাটিয়ে নেমে গেল নিচে।

আমি আবার বিছানায় বসলাম। হঠাৎ পেরেক এসেছে কেন? আর কে-ই বা ওকে উঠতে দিয়েছে ওপরে? কাকু? কাকু কি জানে না আমার শরীরা ভাল নেই?

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। পেরেক যে আসবে সেটা তো নিজেও জানাতে পারত।

পেরেক ঘরে ঢুকল। পিছন-পিছন সেই লোকটাকে ঢুকল।

ঘরে দুটো চেয়ার আছে। পেরেক একটা টেনে লোকটাকে বসতে বলল। তারপর নিজে ধাপস করে বসে পড়ল আমার বিছানায়।

আমি কোণে কথা না বলে চুপ করে তাকিয়ে দেখলাম পরোটা। আমি বৃকতে পারছি কী হতে চলেছে। আর তাই মনের ভিতরে একটা লোহার পেয়ডাল উঠছে আমার। আমায় কেউ যদি কোনও কিছু নিয়ে জোর করে, তা হলে ভিতরে-ভিতরে আমি বিগড়ে যাই।

পেরেকই প্রথম কথা বলল, 'কীয়ে রুকু, তোর ছর?'

আমি বললাম, 'তুই আসবি জানাসনি তো?'

পেরেক হাসল। তারপর খুব শব্দ পেয়েছে এমন করে মনেড়ে বলল, 'আমি কি তোকে চিনি না ভাই? আমি যে আসব সেটা বললে তুই স্ট্রেট আসতে বারণ করতিস।'

আমি দেখলাম, পাশের চেয়ারে বসে লোকটা পুড়ল নাচের আসরে সেখা ভক্ত শ্রদ্ধাঙ্গের মতো মুখ করে বসে রয়েছে।

পেরেক সাইড ব্যাগটা কাঁধ থেকে খুলে রাখল বিছানার এক পাশে। তারপর বলল, 'রুকু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি নীরজ সারদেশাই। তুই তো নিশ্চয় নাম শুনেছিস ওঁর।'

আমি তাকলাম নীরজের দিকে। মুখে সেই নন-রিঅ্যাগ্টিভ হাসি খুলিয়ে লোকটা নমস্কার করল আমায়।

আমি পালটা নমস্কার করলাম না। বরং বিরক্তির গলায় বললাম, 'কী ব্যাপার পেরেক? কেন এসেছিস? এটা কিন্তু ইনট্রান্সন।'

পেরেক বলল, 'রুকু, তুই এমন করে কথা বলছিস কেন? মনে আছে, আগে কতবার তোরের বাড়িতে এসেছি? সব ভুলে গিয়েছিস? এখন আসতে কি পারমিশন লাগবে আমার? পালটে গিয়েছিস এতটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ পালটে গিয়েছি। কারণ, তুইও পালটে গিয়েছিস।'

'দাদা, দাদা,' নীরজ এবার কথা বলল।

আমি তাকলাম। লোকটা মূখু হেসে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

ফরসা, গোলা মুখ। মাথার চুলে লাল রং।

নীরজ ওর লাল রঙের বেলানার মতো গোল-গোল দাঁত দেখিয়ে বলল, 'দাদা, আপ বহৎ গুসসাহে হয়ে হ্যায়। আপ জন্মা ঠাণ্ড রাকখিয়ে।'

আমি বললাম, 'আপনি কী চান?'

নীরজ হাসল, 'এটাই আসল কথা দাদা। গ্যাঙ্কস ফর বিয়িং সো ডাইরে। আমি সাধারণত নিজে এসব কাজে আসি না। কিন্তু পেরেকের থেকে জানলাম ইউ পিপল আর গুড বাড়ি। আর আপনি কত পুণ্ডলীনা করেছেন। পিএইচ ডি করেছেন। বিদেশে থাকেন। আন্ডার স্টেটসই আলাদা। তাই আমি নিজে এলাম আপনার সঙ্গে কর্তব্য বোধে। কারণ, আপনি যে আসবেন না সেটা তো বলেই দিয়েছিলেন।'

আমি কিছু না বলে তাকিয়ে রইলাম নীরজের দিকে।

নীরজ পকেট থেকে একটা রূপার চ্যাপটা কৌটো বের করল। তারপর সেটা খুলে একচিমটে মশলা মুখে দিল। চোখ বন্ধ করে একটু চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি দাদা, মানীর মান দিতে জানি। আই হ্যাড নো ইগো প্রবলেম।'

আমার বিরক্তিতা বাড়ছে। পানমশলার গন্ধ আমার চিরকাল বাজে লাগে। এখন যেন আরও অসহ্য লাগছে আমার।

আমি বললাম, 'মিস্টার সারদেশাই, আমি আমার পোরশানটা বিক্রি করব না। কাম হোয়াট মে। এটা মনে রেখে আপনি পরের কথাগুলো বলবেন।'

'কাম হোয়াট মে।' নীরজ হেসে পেরেকের দিকে তাকাল। তারপর আমায় বলল, 'দাদা, ইউ নিড নট টু বি ব্যাট রিফ্লিড। আই ক্যান অফার ইউ গুড মানি। আমি শুনেছি ইউ নিড মানি নাউ। ব্রাস আপ তো ইমাই ওয়্যাপস আগণে নেহি। তো ফারদা কেয়া হ্যায়? ইউ টেক ইউর মানি অ্যান্ড লিভ।'

'লিভ।' আমি তাকলাম নীরজের দিকে। বললাম, 'এটা আমার পাড়া সেটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। আমি কী করব সেটা আপনি বলে দেবেন? আই আম্য নট ইক্সিট্রিনি ম্যোর মিস্টার সারদেশাই। ইউ মাস্ট টেক ইউর লিভ নাউ।'

নীরজ হাসল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আমি পাশের দুটো বাড়িও কিনব। তার সঙ্গে আপনাদেরটা হলে একটা বড় চাঞ্চ হয়ে যাবে। তিনটেকে ডিমোলিশ করে আমি একটা বড় ফ্লাট বানাব। ঠিক আছে, আমি সেখানে একটা ফ্লাটও দেব আপনাকে। যখন আপনি আসবেন এই দেশে, তখন ওখানে থাকবেন।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়লাম। জানে না তো, আমায় জোর করলে আমার গাঁ আরও বেড়ে যায়। বললাম, 'আমি ডাক্তার

দেখাতে যাব। স্নিগ্ধ, এবার আপনারা আসুন।

নীরজ মুখটা ব্যাঙ্কর করে তাকাল পেরেকের দিকে। তারপর বলল, 'দাদা, ইউ আর মেকিং মি স্টার্বন নাও! আপ মান যাও না! কড়োরা কি বাত হ্যায় ইয়ার! বিক্লেস হ্যায়। ডেন্ট গেট ইমোশনাল দাদা!'

আমি উত্তর না দিয়ে একটা সোয়েটার গায়ে দিলাম। এমনতে ট্যাক প্যাট পরাই আছে। এভাবেই বেরোবে। ডাক্তারটা দেখিয়েই নিই। পেরেক উঠল, 'রকু, জেদ করিস না। ব্যাপারটা বোঝ। কী করবি তুই তোর পোরশানটা রেখে? কে আছে তোর? কে এসে থাকবে এখানে?'

আমি বললাম, 'আমার জীবনের সব বরষ তুই জানবি কী করে পেরেক? তুই তো কোনওদিনই আমার বন্ধু হতে পারিসনি। প্রিভেড করেছিস কিন্তু হতে পারিসনি। আর আমার কে আছে সেটা তোকে বলব কেন? তোরা আয়। আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না তোর সঙ্গে।'

পেরেক আর নীরজ কথা না বাড়িয়ে নেমে গেল নিচে। শুধু নামার আগে নীরজ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে নমস্কার করল একবার।

আমিও এবার বাইরে বেরোলাম। এখন জ্বর খুব একটা নেই। একশো মতো হবে। কিন্তু যদি রাতে বাড়ে তো বিপদ। তা ছাড়া আমার যাওয়ার সময়ও তো হয়ে এল। টিকিট হয়ে গিয়েছে ফেরার। আর ন'দিন বাকি। এখনে আর থাকা যাবে না। তবে যাওয়ার কথা কাকুকে বলিনি এখনও। কারণ, তা হলেই কাকু ওই বিয়ে আর এই বাড়ি নিয়ে অশান্তি করবে।

যেদিন চলে যাব তার আগের দিন বলব কাকুকে। শুধু যাওয়ার আগে এখন আর-একটা কাজ বাকি। স্টোর জন্না যা করতে হবে তা করতেও দিয়েছি যানবপূরের সেই বন্ধুকে। আশা করছি যাওয়ার আগেই করে যেতে পারব কাকুটা।

আমি মোতলায় নামলাম। কাকু দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়। পরনে সোয়েটার আর লুঙ্গি। মাথায় মাঝি কাপ।

আমায় দেখে বলল, 'তুই নীরজকে না করলি?'

আমি বললাম, 'কাকু, আমি আমার জিনিস নিয়ে কী করব সেটা তো আমিই ঠিক করব, নাকি?'

কাকু বলল, 'আরে, তুই ফালতু কেন আটকে রাখবি স্ল্যাট? ও টাকা দেবে। আমায় একটা স্ল্যাট দেবে। তুই থাকিস না, আসিস ও না। কেন এমন করছিস? আমায় বঁশ দিয়ে তোর কী লাভ?'

আমি বললাম, 'ঠাকুমাও তো নিজের অংশ দেবে না। সেটা কী করবে?'

'আরে, মায়ের বাহাঙরে ধরবে। ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। তুই ফালতু কেন করছিস এমন?'

আমি আর দাঁড়ায় না। কাকুকে বলা বৃথা। নিজের সুবিধেমতো কিছু না হলেই কাকু ঘ্যানঘ্যান করে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে-নামতে শুনলাম কাকু বলছে, 'হবে না। যেমন বাপ-মা, ছেলেও তো তেমন হবে। এক মুহুর্ত যদি নিজের দিকটা বাস দিয়ে অন্যের জন্য কিছু করল।'

আমি শুনেও কিছু বললাম না। এমন গায়ে পড়ে যারা ঝগড়া করে তাদের শিক্ষাদীক্ষার বহর নিয়ে চিরকাল আমার সম্মুখে আছে। আর তাদের কথা আর কোনও জবাব দিতে হবে বলেও আমি মনে করি না।

ঘড়িটা দেখলাম। কাকু আমায় বেরোতে দেখেও বাড়ির শোকে বলতে ভুলে গেছে যে, পূজা আসবে!

ভালই হবে দেখা না হলে। কী করব দেখা করে? ও আমায় বিয়ে করতে রাজি নয়, আমিও ওকে বিয়ে করব না। তা হলে ফালতু কথা বাড়িয়ে লাভ কী? আর আমি তো বৃথতেও পারছি না কেন পূজা আসছে? কী এমন দরকার পড়ল।

ঠান্ডা পড়েছে বেশ। তবে আমার ভালই লাগছে। সেই অসহ্য গরম ব্যাপারটা নেই। আমাদের গলি থেকে বেরিয়ে আমি পাড়ার মোড়ের

দিকে এগোলাম। আর তখনই দেখলাম পূজাকে।

এই সেয়েছে। এই সময়ই আসতে হল মেয়েটাকে। আজ সারাদিন তো চুপচাপ বসেই ছিলাম। তখন কেউ এল না আর সন্দের মুখে এমন সব মানুষজন আসছে যে, আমার বিরক্তিই বাড়ছে।

পূজা দেখেছে আমায়। ও হাত তুলে হনন করে এগিয়ে এল।

আমি পাড়ার ভিন রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়লাম। পূজাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। কাকু যে মুড়ে আছে, তাতে কিসের থেকে কী হয়ে যাবে ভগবানই জানে।

পূজা এসে বড় করে হাসল। তারপর চোখের সামনে এসে পড়া চুলটাকে হাত দিয়ে কানের পিছনে নিয়ে বলল, 'তুমি বেরোচ্ছ! আরে, আমি তো তোমার কাছেই আসছিলাম।'

আমি বললাম, 'তো, আমায় ফোন করে সেটা বলোনি কেন?'

পূজা হাসল, 'তোমায় দু'বার ফোন করেছিলাম লাস্ট উইকে। তুমি তো ধরলেই না। তাই ভাবলাম এবারও ধরবে না। তুমি যে আমায় অ্যাডভেড করছ, সেটা তো বৃথতেই পারছি।'

আমি বললাম, 'চলো, হাটতে-হাটতে কথা বলি। আমায় বড়রাস্তায় যেতে হবে।'

'ও? বাড়ি যাবে না? পূজা সামান্য অবাক হল, তারপর বলল, 'ঠিক হ্যাঁ। আমার তোমার সঙ্গে ছোট্ট একটা দরকার আছে। সেটা এখানেও বলা যাবে।'

আমি এগোলাম। পূজাও এল পাশে-পাশে। আমার ভাল লাগছে না। কী বলতে চায় মেয়েটা? আবার কোন ক্যামেলায় পড়তে হবে আমায়?

পূজা বলল, 'রকুদা, তুমি স্নিগ্ধ তোমার কাকুকে বলে দেবে যে, আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি।'

আমি বললাম, 'সেটা অলরেডি অবভিয়াস নয় কি? কারণ, আমি তো ও-এর প্রসবই আর তুলছি না।'

সো, অবভিয়াস নয়, পূজা বলল, 'আরে, আমার বাবা-মা তো লিগৎ শুরু করে দিয়েছে বিয়ের। তারা মৌনতাকে সম্মতি হিসেবে ধরে নিয়েছে।'

আমি অবাক হলাম। আশ্চর্য পাবলিক তো এরা।

'সৌগত ব্রু টেনশন করছে। তুমি রকুদা স্নিগ্ধ, আজই তোমার কাকুকে বলে দাও। আমায় বাঁচাও স্নিগ্ধ, পূজা দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আমার হাঁ হাত।

আমি কিছু বলতে গেলাম। কিন্তু পারলাম না। আমার চোখের কোনা দিয়ে যেন দেখতে পেলাম আবছা একটা ছায়ার ভঙ্গি। তার হেঁটে আসা। মনের অ্যাটেনা বলল, সাবধান। কারণ, এই ভঙ্গিটা আমার বুঝ পরিচিত।

আমি চট করে ঘুরে তাকালাম। অ্যাটেনা ঠিক! তোশানা।

দেখলাম, আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা পূজার দিকে হির চোখে তাকিয়ে রয়েছে ও।

॥ জ ॥

তাকিয়ে রয়েছে, আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তোশানা। আর আমিও লাভায় পোড়া মানুষের মতো হির হয়ে তাকিয়ে রয়েছি ওর দিকে।

আজ দিনটা অভিশপ্ত।

এই দিনের শুরু আর শেষের মধ্যে আমার গোটা জীবনটাই ওলটপলট হয়ে গেল।

মা যে এভাবে নিজেকে শেষ করে দেবে আমি ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম, গরম জলের বড় গামলাটা থেকে রক্ত উলটে পড়েছে মাটিতে। পাশে মা জমে রয়েছে। একা। ফ্যাকাশে।

কোনও চিঠি বা নোট রেখে যায়নি মা। শুধু শূন্য একটা ঘর।

গোছানো টেবিল। আলনায় পাট করে রাখা জামাকাপড়। স্বেসিং টেবিলের আয়নায় আটকানো টিণ। চানটান করে পাতা বিছানার চাদর। সব ঠিক ছিল। শুধু মা ছিল না!

পরের পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন আবছা। কেমন যেন মোম-কাগজে ঢাকা। আমার মন নিথর হয়ে গিয়েছিল পরের সময়কুহুতে। শুধু পাথরের মতো চোখ নিয়ে দেখেছিলাম, বাবা এসে দাঁড়াল মায়ের সামনে। কথা বলতে পারছিল না বাবা। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাত্তিল এমিক-ওমিক। তারপর পুলিশ এল। ডাক্তার এল। আরও কারা-কারা যেন এল। সারা পাড়া ভেঙে পড়েছিল আমাদের বাড়ির সামনে। প্যাভেলের মতো খেমে গিয়েছিল কখন। আলোগুলো নিভে গিয়েছিল এক-একে। আমি বারান্দায় একটা চেয়ারে বসেছিলাম একা। পুলিশ কীসব প্রশ্ন করছিল, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। মাথার ভিতরে টকটকে রক্তটা ভেঁা বাজছিল শুধু। মনে হচ্ছিল তা হলে? তা হলে আমার আর কী রইল?

ভিতরে মধ্যে আমি একটা মুখ বুজছিলাম। দেখেছিলাম পেরেক, আর্থ সবাই এসেছে। কিন্তু এই মুখ তো আমি বুজছি না। আসল মুখটা কোথায়? কোথায় লুকিয়ে আছে সে?

কাকিমা এসে মাথায় হাত দিয়ে কী যেন বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। বাবা এক পাশ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিল পুলিশকে। বাইরে থেকে কিছু লোক চিংকার করে বাবার নামে গালাগালি দিচ্ছিল। বলছিল, এই লোকটার জন্যই মা মারা গিয়েছে। আমি সব শুনিছিলাম। দেখছিলাম। কিন্তু সত্যি করে আমার ভিতরে কিছু ঢুকছিল না। আমার মনে আলো ছিল না, অন্ধকার ছিল না। শুধু এক অনন্ত গোথলি যেন নেমে এসেছিল আমার মধ্যে। কে যেন আমায় বলছিল এই গোথলিটুকুই আমার ভবিষ্যৎ। এই গোথলিটুকুই আমার জীবনের সারাংশ। বলছিল, বাকি জীবনটা এই গোথলি নিয়েই আমাকে যেতে হবে অনেক অনেক দূর, একা।

বাবাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা অনেক করে পুলিশকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে, বাবার এতে কোনও ভূমিকা নেই। কিন্তু পুলিশ শোনেনি। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম, বাবাকে ডাক্তার তোলার সময় কারা যেন জুতো ছুড়ে মেরেছিল। কারা যেন দিলে ছুড়েছিল গাড়িতে। বাবা দু'হাতে মাথা বাচিয়ে উঠে পড়েছিল প্রক্টন ডানে।

পুলিশের একজন অফিসার এসে আমায় বলেছিল, 'কেমন ছেলে তুমি? মাকে বাঁচাতে পারলে না? আমরা বডি নিয়ে গেলাম। পরে ধান্য এসে পেপার নিয়ে যেয়ে। কাটা পুকুর থেকে লাশ হাড়তে হবে তো!'

একটা ময়লা কাপড়ে ঢেকে মাকে অন্য একটা গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। বলেছিল, এই ঘরটা দু'দিন বন্ধ থাকবে। কীসব নাকি ক্রীম পরীক্ষা আছে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এরপর কী হবে, কী করতে হবে, আমি কী করব সব ভুলিয়ে গিয়েছিল আমার।

পুলিশ চলে যাওয়ার পর ধীরে-ধীরে ভিড় পাড়সা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন মহিলা 'আহা' 'উহ' করতে ঘরে আসতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু কাঁচা তাদের আসতে দেয়নি। তারপর আমার কাছ এসে বলেছিল, 'তুই আজ উপরে আমাদের সঙ্গে বাবি। কাল আমি যাব তোর সঙ্গে থানায়। একা যাবি না। বৃক্ষলি?'

আমি কী করব বুঝতে না পেয়ে শুধু মাথা নেড়েছিলাম। খাব? আঙ্গ? এই অবস্থায় পেটে খাবার ঢুকবে? আমার চোখের সামনে কেবলই ওই দৃশ্যটা ভেসে উঠছিল। ফ্যাকাসে মুখ, নীলচে ঠোঁট, আধাবোজা চোখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পাড়া জল। মা কাঁদছিল। কেন কাঁদছিল মা? আমার কথা কী মায়ের মনে পড়েছিল শেষ সময়? তা হলে কেন এমন করল মা? আমার কথা একাটানোর শাল না। কত যন্ত্রণা পেয়েছিল মা? কতটা মনের যন্ত্রণা পেলে মানুষ নিজেকে এমন করে শেষ করে দিতে পারে? এমন পৃথিবী ছেড়ে মানুষ চলে যায়

কিসের কষ্টে?

সেই রাতে কিছু খেতে পারিনি আমি। ঘুমোতে পারিনি। তিন তলার ঘরে, বিছানায় এক পাশ হয়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম। দূরে বাজনা বাজছিল। এক-এক করে ঠাকুর যাচ্ছিল বিসর্জনে। আমি পটকার শব্দ শুনিছিলাম। আবছা আনন্দের হুড়ো হুড়ো শুনিছিলাম। আর মনে-মনে দেখছিলাম, অন্ধকার জলে চলে পদ্ম পূর্ণা মা। শ্মশিক ভাসল তারপর ধীরে-ধীরে ডুবে গেল। জলের তলায় ক্রমে আবছা হয়ে এল ঠাকুরের মুখ। আমার মায়ের মুখ।

আমি ষড়ফুড করে উঠে বসেছিলাম বিছানায়। নিকষ অন্ধকার ঘর। জানালা দিয়ে আবছা আকাশ দেখা যাচ্ছিল। আমি অন্ধকারে ভুতের মতো বসেছিলাম একা। আর সেই প্রথম মাটি ফেটে উঠে এসেছিল জল। আমি বালিশে মুখ গুঁজে দিয়েছিলাম।

আসলে আমি তো সেই স্থল থেকে ফিরেছিলাম তখন। জল ছিটকে, লাফিয়ে স্নান করছিলাম সারা উঠানে জুড়ে। আর মা, আমার অল্পবয়সি মা, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিল। তারপর একসময় কোলের কাছে টেনে নিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল মাথা। সেই রাতেও মা এসে বসেছিল আমার পাশে। আমি জানি, আজ থেকে সারা জীবন যতবার আমি একা হয়ে যাব মা এসে বসবে আমার পাশে!

সব কাজকর্ম সেরে মাকে পেতে পেতে আজ পূর্ণ হয়েছে গিয়েছিল। কাপড়ের আড়াল থেকে মায়ের মুখ আর গলাটুকু বেরিয়েছিল শুধু। তাতে বাকি শরীরটায় রক্তার সেলাইয়ের মতো কাঁড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। আমি রক্ত সরিয়ে নিয়েছিলাম চোখ।

আমার কানে কাকু হাড়াও পেরেক আর আর্থও গিয়েছিল। মাকে জোরে গাড়িতে তুলে সঙ্গে আনা ফুল দিয়ে গাড়ি সাজিয়েছিল ওরা। ধূপকাঠির গোছা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাস্তাটিকে। আর প্রচুর পারফিউম ছড়ানো হচ্ছিল।

গাড়িতে বসে পেরেক জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোরা বাবা, মানে কাকুকে দেখতে গিবেছিস? মানে, কী হয়েছে জানিস?'

আমি কথা বলিনি। বলতে ইচ্ছা করছিল না। আর বাবা? আমার গা গোলাপিলা বাবার কথা মনে করে। আমার তো বাবা নেই। বাবা তো বহুদিন আগেই আমায় ছেড়ে গিয়েছিল। তাই বাবাকে দেখতে যাব কেন? বাবার যারা নিজের লোক আছে তারা ই বাবে।

পেরেক তা-ও বলেছিল, 'তুইই বললে, আমি একটা ব্যবস্থা করতে পারি। মানে, ফালতু তোরা বদনাম হয়ে যাচ্ছে তো। এই দেখ না তোশানাদের বাড়িতে তোকে নিয়ে কীসব কথা হচ্ছে!'

আমি চোয়াল শক্ত করে পেরেকের দিকে তাকিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'তোরা কাছে আমি জানতে চেয়েছি কোথায় আমায় নিয়ে কী কথা হচ্ছে? তোশানার কথা আমার কাছে বলবি না!'

আমার রাগ হচ্ছিল হঠাৎ। এই ক'দিন তোশানা তো একবারও আসেনি। জানতেও তো চাননি আমার কী হল! তা হলে ওর কথা শুনব কেন? নাটক করে সেদিন প্যাভেলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল কেন? আমি যদি সেদিন বাড়ি থেকে না বেরোতাম তা হলে তো মা... আমি আর ভাবতে পারছিলাম না। মাথটা জানালায় রেখে চোখ বন্ধ করে বসেছিলাম। সময়ের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম নিজেকে। পেরেক তা-ও কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলেছিল, 'তোশানার মা তো বলছিল, তোকে দেখেই নাকি বুকেছিল তোর পরিবারে সমস্যা আছে। আর ঠিক ভিগিনান নিয়েছিল। তোশানাকে ভুলে যা। তোর মতো ব্রাইট ছেলে অনেক ভাল মেয়ে পাবে!'

আমি কোনও উত্তর দিইনি। বিরক্তি দেখানোর মতোও মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। শুধু তার মধ্যেও বুকেছিলাম পুরনো পেরেক আর নেই। একদম পালটে গিয়েছে।

দুনিয়ান পাঠক এক ইং! ~ www.amarboi.com ~



শিকাগো শহরের আন্সমোড়া ভাঙে, আন্সে-আন্সে নিতে আসে রাত্তার আলো।

মায়ের কাছে গিয়ে দেখি পুরুতমশাই এসে গিয়েছেন।

কাকু বলেছিল, 'তুই জুতোটা খুলে আয় রকু। এখানে একটু কুজ আছে।' মায়ের মুখটা দেখছিলাম আমি। চোখ দুটো বোজা। রুই দিন পর যেন নিকিস্তে ঘুমোচ্ছে মা!

চুল্লির মুখটা খোলার সময় আমি শেষবারের মতো তাকিয়েছিলাম মায়ের দিকে। মনে হয়েছিল মা এই আছে, আর-একটু পর সম্পূর্ণ নেই হয়ে যাবে। আর কোনওদিন দেখা হবে না। হিন্দু হিসেবে আমারও তো জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস থাকা উচিত। কিন্তু আমি জানি, যা আছে যতটুকু আছে সব এখানেই, এই পৃথিবীতেই আছে। এর পর আর কিছু নেই। যা যায় তা চলেই যায়, আর ফিরে আসে না। শুধু তাদের ফেলে যাওয়া কিছু সময়ের টুকরো হড়িয়ে থাকে আমাদের সারা জীবন জুড়ে!

আমি বাইরে এসে বসেছিলাম। বিকেল ধীরে-ধীরে বাক নিশ্চিল সন্দের দিকে। যারা এসেছিল তারা বলছিল, 'পঞ্চাশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা তো লাগবেই চুল্লিতে! চল, চা খেয়ে আনি।'

শ্রাশনের মেন গেটের উলটো দিকেই বেশ কয়েকটা চায়ের দোকান। শ্রাশনযাত্রীদের নিয়ে কাকু এগিয়ে গিয়েছিল সেই দিকে। আমি যাইনি। একা গিয়ে বসেছিলাম পাশের একটা সিঁড়িতে। এদিকেও ইলেকট্রিক চুল্লি রয়েছে। কিন্তু সেটা বন্ধ। তার সামনেটা কোলাপসিবল গেট দিয়ে আটকানো। আমি সেই সিঁড়িতে বসে মাথা নিচু করে ছিলাম। আমার শরীর ব্যাপ লাগছিল খুব। মনে হচ্ছিল আর একটু শক্তিও অবশিষ্ট নেই!

এক ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে গিয়েছিল কে জানে। কাকু এসে ডেকেছিল আমায়। বলেছিল, 'লল, নাইকুও নিতে হবে।'

চুল্লির পিছন দিকে একটা সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। আমি সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলাম। এই জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। চুল্লির গনগনে আগুনের আঁচে গরম। মাংস পোড়ার তিতকুটে একটা গন্ধ

পাক মারছিল চারদিকে। আমার গা ওলোচ্ছিল খুব। মাথাব্যথা করছিল। তা-ও নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

একটা মালসার উপর গঙ্গামাটি, আর তার উপর একটা পোড়া মাংসের টুকরো দিয়ে আমায় বলা হয়েছিল এই আমার মায়ের শেখটুকু।

তারপর হ হ গাড়ি। কলকাতার ভিড়। শেষ শরতের হাওয়া। সন্দের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা জীবন।

গঙ্গার ঘাটে জোয়ার ছিল। লাল ফাটা-ফাটা সিঁড়িগুলো দিয়ে কিছুটা নেমে হাটু ভুবিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম জলে। সামনে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লক্স ডেউয়ের ধাক্কা নড়ছিল অল্প-অল্প করে।

কাকু পিঠে হাত রেখে বলেছিল, 'দে রকু, ভাসিয়ে দে।'

মালসাটাকে শেষবারের মতো দেখেছিলাম আমি। দু'হাত দিয়ে তার উজ্জতা শেষবারের মতো শুষে নিয়েছিলাম প্রাণপণ। আর বুঝতে পারছিলাম, আজ থেকে আবার আমার নতুন জন্ম হল। আজ থেকে আমি বড় হয়ে গেলাম। 'মা আছে' বলতে পারার বয়স পেরিয়ে আমি 'মা ছিল'-র বয়সে ঢুক পড়লাম!

মালসাটা জলে পড়ে যেন ধমকে গিয়েছিল একটু। যেন যেতে চাইছিল না। যেন সে-ও শেষবারের মতো সেখে নিতে চাইছিল আমার মুখটুকু। মা যেন শেষবার মুখ তুলে তাকিয়েছিল সন্তানের দিকে। তারপর ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল অন্ধকার জলের গভীরে।

দূরে বিদ্যাসাগর সেতুর উপর জ্বলে ওঠা সার-সার আলো ছায়া ফেলেছিল নিচের বহমান জলে। আমি মনে-মনে সেই আলোছায়াটুকু নিয়ে ফিরেছিলাম বাড়ি!

বাড়িটা অন্ধকারে ডুবেছিল আজ। আমি গেটা বুলে বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়েছিলাম। কাকিমা লোহা আর আগুন ছুঁয়ে বলেছিল, 'আয়।' আমি রবারের হাওয়াই চরল বুলে ঢুকেছিলাম ভিতরে।

তারপর ধীরে-ধীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ঠাকুরার ঘরের দরজায়। ঠাকুরা বিছানার উপর বসেছিল খুম হয়ে। ঘরে ছোট একটা অন্ধম আলো জ্বলছিল শুধু। আমার ঘরে ঢোকার শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল ঠাকুরা। তারপর ধরা গলায় বলেছিল, 'এটা কী হল রুকু? তোকে এই বেশে দেখব আমি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। কী হল এটা? ভগবান তুমি এমন কেন করলে আমার সঙ্গে? এই জন্য আমি রোজ তোমার গুজো করি?'

আমার কিছু বলার ছিল না। আমি শিখন ফিরে বেরিয়ে এসেছিলাম ঘর থেকে। তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিলাম উপরে।

পাকু আর বিলু এসে দাঁড়িয়েছিল দোতলার বারান্দায়। আমি দেখেছিলাম, বিলুর চোখে জ্বল। আর পাকু পথ হারানো বালিকার মতো তাকিয়ে রয়েছে। এমন সাদা পোশাকে তো আগে কাউকে দেখিনি।

বিলু হাত দিয়ে চোখটা মুছে, নাক টেনে বলেছিল, 'তোর ঘরে একটা মেয়ে এসেছে দাদাভাই!'

মেয়ে! আমি কিছু না জিজ্ঞেস করে ধীরে-ধীরে তিনতলায় উঠে গিয়েছিলাম। আমার ঘরের দরজাটা খোলা ছিল। আমি ধমকে গিয়েছিলাম একটা বিলু বলল একটা মেয়ে এসেছে। কিন্তু কে এসেছে সেটা তো বলল না। কে আসতে পারে আর। আমার অন্ধকার বুকের ভিতর এই নেন প্রথম একরঙি আলো জ্বলে উঠেছিল। তোশানা কি? ঘরের দরজা খুলে আমি হির হয়ে ছিলাম এক মুহূর্ত। আর ছোট্ট আলোটা নিভে গিয়েছিল নিম্নে।

টিউব লাইটের আলোয় জিনিতাকে আজ কেমন যেন স্ত্রিয়মণ লাগছিল। আমার দেখে জিনিতা প্রায় সোঁড়ে এসেছিল। আমি ঘরে ঢুকে আর এগোতে পারিনি। জিনিতা একদম আমার বুকের উপর এসে আছড়ে পড়েছিল। তারপর আমার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'তুই কেমন আছিস রুকু? আমার একবারও খবর দিগনি? একবারও আমায় জানাসনি? এত নিষ্ঠুর তুই? তোরা কষ্ট কি আমার কষ্ট নয়? এত কিছু হয়ে গেল আর সব একা সব্য করলি। এটা কী করলি রুকু? আমি কি তোরা কেউ নই?'

আমি জিনিতাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পান্থনিক জিনিতা আমায় জড়িয়ে তখনও কীসব যেন বলে চলেছিল। আর তার মধ্যই আমি সিঁড়িতে খুব আলতো একটা পায়ের আওয়াজ পেয়েছিলাম। আমার চোখের কোনো দিয়ে যেন দেখতে পেয়েছিলাম আবছা একটা ছায়ার ভঙ্গি। তার হেঁটে আসা। দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়েছিলাম আমি।

সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পাখরের মূর্তি। তাকিয়ে রয়েছে, আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তোশানা। আর আমিও লাভায় শোড়া মানুষের মতো হির হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

কয়েক মুহূর্তের ভিতর যেন ঢুকে এসেছে অনন্তকাল। তোশানা চোখাল শব্দ করল শুধু একবার। তারপর তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

'হাটু', আমি প্রাণপণে জিনিতার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। কিন্তু তোশানা কই! দোতলার সিঁড়ির ব্যাণ্ডিংয়ে এসে বাইরের গেটের বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। তোশানা চলে গেল। এভাবে!

আমি কী করব বুঝতে পারলাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম সামনের আবছায়ায়। বৃণ্ডলাম, অন্ধকার একটা সিঁড়ি নেমে গিয়েছে বিসর্জনের দিকে।

নয়

এখনও বুকের ভিতর বিসর্জনের দিকে নেমে যাওয়া অন্ধকার সেই সিঁড়িটা নিয়ে ঘুরছি আমি। এই শহর ছেড়ে যত দূরেই যাই না কেন,

সেই শূন্য সিঁড়ি ঠিক আমার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। যেন মাঝরাতেই পথিকের মাথার উপর ছায়া হয়ে লেগে থাকা শুকনো, ভাঙা চাঁদ।

সেদিন তোশানা চলে গিয়েছিল কিছু না বলে। আমি তার পরের দিন সকালবেলা গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি। আমি জানি এসব সময় এমন করতে নেই। কিন্তু মনে হয়েছিল জীবনে তো শুধু এটুকুই বেঁচে আছে আমার। এটাও চলে যাবে? দুঃখ মানুষ আমায়, তাই যেভাবেই হোক শেষ কাঠের টুকরোটা ধরে রাখতেই হবে আমার।

আজ এই চৌত্রিশ বছরে এসে বুঝি সেই চক্কিশ বছরে কত ছেলেমানুষি ছিলাম। বুঝি, পরের দিন এইভাবে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি।

এখনও মনে আছে সেদিন ওদের দরজা খুলে দিয়েছিলেন তোশানার মা। তারপর আমায় দেখেই এমন করে মুখ করে উঠেছিলেন নেন আমি অশ্পুষ্য। যেন আমি এসেছি জানলে সমাজে ওঁর খোপা-নাগিত বন্ধ হবে।

আমি নিজের অজান্তেই দু'হাত জড়ো করে বলেছিলাম, 'একবার তোশানার সঙ্গে দেখা করা যাবে? স্নিগ্ধ। আমার খুব দরকার। খুবই দরকার। স্নিগ্ধ!'

ওর মা বিরক্ত মুখে দেখেছিলেন আমায়। তারপর দয়া করার মতো করে বলেছিলেন, 'দাঁড়াও এবানো। আমি ডেকে দিচ্ছি। ঘরে ঢুকবে না।' আমি ঘরে ঢুকিনি। এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম সাদা কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে।

শুনেছিলাম ওর মা চৈতন্যে বলাছেন, 'দেখ, তোরা সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে। এর লজ্জা নেই নাকি? এমন সময় কেউ আসে? আর থাকবেই বা কেমন করে। যে বাপ-মায়ের ছেলে।' পেরেক ঠিকই বলে। তুই ওকে কেন লাই দিয়েছিলি পুণ? নে, দেখ এবার, লাই দিলে কী হয় দেখুন রাজাভাড়া' বিস্ময় কর এটাকে। পাড়ায় আমাদের একটা সম্মানী আছে তো!'

আমি মা'তে-দাঁত চেপে দাঁড়িয়েছিলাম তা-ও। অপেক্ষা করছিলাম কখন আসবে তোশানা।

তোশানা এসেছিল। আলতো পায়ের, দরজাটা খুলে এসে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনে। তবে মুখ তুলছিল না। তাকান্ছিল না আমার দিকে। আমি দেখেছিলাম কেমন যেন ফ্যাকাসে চোখমুখ ওর। এলোমেলো চুল।

আমি বলেছিলাম, 'তোশানা, তুমি কাল ওভাবে চলে এলে। তুমি যা দেখেছ তা কিন্তু সত্যি নয়। আমি কিছু বোঝার চেষ্টাই...'

'চুপ কর', তোশানা এইবার চোখ তুলেছিল। আচল শব্দ করে বলেছিল, 'কাল মাকে দাধ করিয়ে এসে একটা মেয়েকে জড়িয়ে ধরতে তোমার লজ্জা লাগেনি। আর আজ এবার আমার শিখনে সৌচ্ছন্দ্য। কত বড় লস্ট! তুমি? শোনো, আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। কেনে রাখো, তুমি মরে গেলেও আমি তোমার মুখ দেখব না। আর কোনওদিন এখানে আসবে না। যাও!'

এখন ডারে যখন শিকাগো শহরের আড়মোড়া ভাঙে, আন্ত-আন্তে নিভে আসে রাস্তার আলো। যখন কুয়াশা ভিতর দিয়ে আমি একা সৌড়ে যাই মিশিগান লেকের দিকে, তখনও নিশ্চিতভাবে আমার মনে আসে তোশানার কথা। ওর সেই আঙুল দিয়ে কপাল থেকে চুল সরানো। সেই ডান দিকে ব্যাগ কাঁধে মাথা নিচু করে রাস্তা পার হয়ে যাওয়া বা ঠিক সন্ধ্যার মুখে ভিড়ের মধ্যে থেকেও শুধুমাত্র আমার জন্য রেখে যাওয়া এক মুহূর্তের দৃষ্টি। আমি সৌচ্ছন্দ্য-সৌচ্ছন্দ্যে একসময় নিজের অজান্তেই থেমে যাই। তারপর পায়ের-পায়ের গিয়ে দাঁড়াই জলের কাছে। তাকিয়ে থাকি আনমনে। জলে ভাঁজ রেখে যায় হাওয়া। আমি বুঝি, বাকি জীবন এটুকু নিজেই থেকে যেতে হবে হয়তো। মনে হয় আর-একবার যদি সুযোগ পেতাম জীবনে। তোশানা তো বলেইছিল ও খুব রাগী। ওকে যেন কখনও রাগিয়ে না দিই। সেই জলের ধারে দাঁড়িয়ে ভাবি, যদি একবার, শেষবার সেই রাগটা ভাঙানোর সুযোগ আসত! ওর মনের উপর জড়িয়ে থাকা যে মোম-কাগজটা ওর দৃষ্টিকে

আবছা করে রাখে, সেটাকে যদি ছিড়ে ফেলে দিতে পারতাম। না, একে ফিরিয়ে আনার জন্য নয়, শুধু ও যে ভুলটুকু করে বসে রইল সারা জীবন, সেটা ভেঙে দেওয়ার সুযোগ যদি একবার পেতাম! একবার যদি বলতে পারতাম, আমি আসলে সেদিনের মতো আজ্ঞও...আজ্ঞও আমার বয়স সেই চকির বছরেই আটকে আছে। আজ্ঞও ওর কথা মনে পড়লে মাথার ওপর পিগামারিটের তুবারপাত শুরু হয়। আজ্ঞও আমি লাইব্রেরির দরজায়, কফি হাউসের সামনে, ছোট সেই গলির অন্ধকারে ঘাড়িয়ে রয়েছি। না, কোনও আশা বা লক্ষ্য নিয়ে নয়, শুধুমাত্র সত্যিকার শেখবারের মতো ওকে জানাব বলে। একবার! শেখবার। জীবন সুযোগ দেয়। আমায় দিয়েছে। শেখবারের মতো আজ সুযোগ এসেছে আমার। শেখবারের মতো আজ আমি চেষ্টা করব এত বছরের মোম-কাগজটা ছিড়ে ফেলতে। আমি উত্তরের দিকে তাকলাম। শীতের ঘোঁরাশায় আবছা আকাশ। তার মধ্যেও দু'চারটে তারা ফ্ফল্ফল করছে। আমি ডাবলাম পরশদিনের রাতটা আমি শিকারায় দেখব। আর কি কোনওদিন ফিরে আসা হবে এই শহরে? জানি না।

কাল ফিকেলের ফ্রাইট আমার। মদময় থেকে দিল্লি। সেখান থেকে কানেশিই ফ্রাইটে সোজা আটলান্টিকের ওপার। ঘড়ি দেখলাম। রাত সাড়ে দশটা বাজে। আমি টাঙ্গার বেলেটোশনের সিঁথি দিয়ে নামলাম। ফাঁকা রাস্তাটা পার করতে-করতে ডাবলাম, তোশানার দেখা কি পাব? শীতল ঠিক বর দিয়েছে তো? কলকাতায় যে-সকলদুর্গুণ কাজটা বাকি ছিল, সেটাও বিবেকবেলা সেরে ফেলেছি। আজ সোনারপুর গিয়েছিলাম। বাবার কাছে। না, আমি জানিয়ে যাইনি কিছু। আসলে জানানোর তো কিছু ছিল না। আমি যেটুকু ঠিক মনে করছি, সেটুকুই করতে গিয়েছিলাম মাত্র।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা প্রায় দু'মাস জেলে ছিল। তারপর ছাড়া পেয়ে যায়। আমি তার মধ্যে একদিনও যাইনি জেলে। ঠাকুমা বা কাকুও এ নিয়ে আমায় কিছু বলেনি। ছেলে থেকে ছাড়া পেয়ে বাবা একদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। নিজের কিছু দরকারি জিনিসপত্র আর কাগজ নিয়ে চলে গিয়েছিল। বাবা যতটুকু সময় ধরে ছিল, আবার বাড়িতেই ঢুকিনি।

তারপর সময় কেটেছে। আমি পড়াশোনার মন দিয়ে মাসের কলেক্স থেকে পাশ করে বিদেশে যাওয়ার পরীক্ষায় বসেছি। পেয়েও গিয়েছি সুযোগ। বাস, আর পিছনে ফিরে তাকাইনি। তারপর নতুন দেশ। আবার নতুন করে শুরু করতে চাওয়া একটা জীবন। ও দেশে যাওয়ার পর বিলুর সঙ্গে ই-মেলে যোগাযোগ ছিল কিছুদিন। তবুই জানতে পারি তোশানার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে ডাক্তার। মুখইয়ে থাকে। আজ্ঞও মনে আছে, ছোট একটা দু'লাইনের ই-মেলে বরটা জানিয়েছিল বিলু, আর তাতে প্রায় দুটো মাস সব কিছু সাদা হয়ে গিয়েছিল আমরা। যেন মনবারায়ের তুবারপাতে ঢেকে গিয়েছিল সব।

সেই যে ডেবেছিলাম কলকাতার সব কিছু ছেড়ে এসে আবার নতুন করে শুরু করলাম এখানে, তোশানার বিয়ের বরটা পেয়ে বুঝেছিলাম আসলে কিছুই ছেড়ে আসতে পারিনি আমি। বুঝেছিলাম, কোনওদিনই কিছু ছেড়ে আসতে পারব না। কারণ, একটা অন্ধকার সিঁড়ি সারাক্ষণ ঘুরছে আমার সারা। রাত্তা পেরিয়ে আমি একটা পানের দোকানের সামনে থামলাম। সোনারপুরে এমন বাইয়ে দিয়েছে যে, হাঁসবাক্য করছে শরীরটা। আজ পৌষ সংক্রান্তি। ঋতুর মা নারকেলের পিঠে বানিয়েছিলেন। পোলাও আর মাংসের পরে সৌণ্ড খেতে হয়েছে। এসব আমার সহ্য হয় না।

বিবেকে আমাকে সোনারপুরে দেখে ঋতি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। তবে ওর মুখ দেখে বুঝেছিলাম খুশি হয়েছে ঋতি।

বলেছিল, 'দাদা, তুমি?'

খতি আমার 'তুমি' বলছে দেখে ভাল লেগেছিল খুব।

আমি হেসে বলেছিলাম, 'কেন আসতে নেই?'

'কে রে ঋতি?' পাশের ঘর থেকে ঋতির মা এসে আমায় দেখে

ধমকে গিয়েছিলেন প্রথমে। তারপর বলেছিলেন, 'ও বাবা তুমি! এসো, এখানে!'

আমি ছুতোজোড়া ছোট উত্তোনটায় খুলে ঢুকছিলাম ঘরে। ঘরটা আগের দিনের মতোই সুশ্রব করে সাজানো ছিল। বিদ্যনায় টানটান করে চান্দর পাতা। টেবিলে গোছানো বই। দরজা আর জানালায় টাঙানো শাড়ি কেটে তৈরি করা পরমা।

ঋতি বলেছিল, 'দাদা, তুমি আমার বিদ্যনায় বসো।'

'তুমি কী রে? আপনি করে বল,' ওর মা ঝাঝিয়ে উঠেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, 'কেন? তুমিই তো ঠিক আছে।'

বিদ্যনায় বসে আমি ব্যাগ থেকে বড় একটা চকোলেটের ব্যাগ বের করে দিয়েছিলাম ঋতিকে। ব্যাগটা দেখে একই সঙ্গে ঋতির মুখে আনন্দ আর লজ্জা দেখেছিলাম। ও ব্যাগটা না নিয়ে হাত গুটিয়ে দাড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'কী হল, ধরো। আমি এটা ধরে বসে থাকব না কি?'

ঋতি সিনেচারের সঙ্গে নিয়েছিল ব্যাগটা।

'তুই এসব আনিস কেন?'

আমি খুব তুলে দেখেছিলাম বাবা এসে বসেছিল ঘরে। বাবাকে দুর্বল লাগছিল খুব। তবু তার ভিতরেও হাসি ছিল মুখে। গরল কাছে চিন্তিতো ব্যথা করে উঠেছিল হঠাৎ। ছোটবেলায় এই মানুষটার হাত জড়িয়ে ধরে না শুলে আমার ঘুম আসত না। আর আজ কত দূর সরে গিয়েছি আমরা। না, আমি তো সরে যাইনি। এখন বুঝি, এতগুলো বছর আসলে সব কিছুই কাছ থেকে সরে যাওয়ার ডান করেছিলাম মাত্র। রাগ করে, ভেব করে মুখ ফিরিয়েছিলাম মাত্র। আসলে আমার যা কিছু তা আজ্ঞও এই ভাতাচোরার শহরটাতেই পড়ে রয়েছে।

আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। বাবার জেল থেকে ছাড়া পাওয়াবুঝে চাকরিটা যায়। তারপর টুকটাক এটা-ওটা করে টানতে-টানতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। শরীর ব্যারপের জন্য বাবা আর স্বাস্থ্য করতে পারেন না। ঋতি মা কাজ করে। সেলাইয়ের কাজ। একটা লেডিস টোলার্স সেলাই করে ওর মা। তা ছাড়াও বাড়িতে আভার গারমেন্টস-এর ছোট ছোট লেবেল লাগায়। পার পিস হিসেবে পেমেট করা হয়। আগের দিন এসে এসব জেনেছি।

বাবা বলেছিল, 'তুই এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন রকু? শরীর ব্যারাপ?'

আমি বলেছিলাম, 'না বাবা, আমি ঠিক আছি। কাল চলে যাবি।'

'আঁ? কাল?' বাবা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেছিল, 'কালকেই।'

আমি হেসেছিলাম একটু। তারপর ব্যাগ থেকে একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে বলেছিলাম, 'এটা ঋতির জন্য।'

'কী?' ঋতির মা এসে নিয়েছিলেন প্যাকেটটা।

আমি বলেছিলাম, 'ওই বাড়িতে আমার যে অংশটা ছিল সেটা ঋতিকে দিয়ে গেলাম।'

'মানে?' বাবা অশক্ত শরীর নিয়েও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। উলে প্রায় পড়ে যাবি। আমি দ্রুত উঠে দাঁড়াতে ধরেছিলাম বাবাকে।

সেই মিনি। সেই হাত। কাছে যাওয়া মাত্র সেই ছোটবেলার গন্ধ! আমার বাবা।

'কেন রকু? এভাবে আমায় শাস্তি দিয়ে যাবি?' বাবা অবশ গলায় বলেছিল আমায়।

আমি বাবাকে এনে বিদ্যনায় বসিয়ে বলেছিলাম, 'শান্তি আমি পেয়েছি বাবা। সারা জীবন পেয়েছি। জানি, বাকি জীবনটাও পাব। কিন্তু আমার সঙ্গে যাই হোক, ঋতি আমার বোন তো। ওর দিকটা তো দেখতেই হবে।'

বাবা কিছু না বলে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল শুধু। আমি দেখেছিলাম ঋতি আর ঋতির মা এসে দাঁড়িয়েছেন বাবার পাশে। আমি কিন্তু উঠে যাইনি। জানি না, এই পারিবারিক দৃশ্য আমি যেমানান কি না, কিন্তু

তবু উঠে যেতে পারিনি। বাবা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল। আজ আমি বড় হয়ে গিয়েছিলাম, আর বাবা যেন ফিরে গিয়েছিল নিজের ছোটবেলায়।

আমাকে ছাড়েনি ওরা। বিশেষ করে খতি। এত কথা বলতে পারে মেয়েটা? আমি তো প্রথম দিন দেখে ডাবতই পারিনি। আর কী ভাল গান গায়। রাতের খাবার খাইয়ে তবে আমায় আসতে দিয়েছিল সবাই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার আগে আমি সাময়িক গিয়েছিলাম একটু। তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করেছিলাম খতির মাকে। উনি যেন চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু আমায় থাণা দেওয়ার সময় পাননি।

তারপর বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বাবা আর প্রণাম করতে দেয়নি। শুধু দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল, 'ঠাকুর, আমি তো পারিনি, তুমি আমার ছেলটাকে দেখো!'

ঠাকুর কি দেখেন কাউকে? আমি কীবনে যতবার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেই ভদ্রকাল বা ভদ্রমহিলায় সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়েছি সেখানি, আকাশের ব্যালকনি ফাঁকা। সেখানে কেউ নেই! তবু হয়তো কেউ থাকে। না হলে এত বছর পেরিয়ে এসে কেন খতির সামনে বসলে এত ভাল লাগে আমার।

আমি ঘড়ি দেখলাম। ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে এগোচ্ছে। শীতলের কথাগুলো এখনও সময় আছে মিনিট দশেক। শীতল যে আমায় এভাবে সাহায্য করবে ভাবতে পারিনি।

সেদিন পূজাকে আমার হাত ধরে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তোশানার মূর্খবোনে ঘেঁষে গিয়েছিল নিজেকে। প্রথমে প্রচণ্ড রাগ তারপর অবহেলা। যেন বলতে চাইছিল, 'এই জন্যই তো আমি তোমায়...'

পুরো ব্যাপারটা ঘটতে ঠিক পাঁচ সেকেন্ড সময় লেগেছিল বজ্রঝোঁর। কিন্তু ওই সময়টুকুর মধ্যেই আমার বুকের ভিতরটা কঁপে গিয়েছিল একদম! এই রে, আমার সর্বনাশ হল! এ মেয়ে তো ভুল বুঝতে ওস্তাদ। আমি পূজার হাতটা ছাড়িয়ে দৌড়ে গিয়েছিলাম তোশানার দিকে। ডেকেছিলাম নাম ধরে। কিন্তু ও দাঁড়ায়নি।

আমি বলেছিলাম, 'তোশানা! আরে, আমার কথাটা তো শোনাও! স্লিক্স, মার্স লিসন টু মাই ফর হেভেনস সেক!'।

স্বর্ণ, দাঁত পাভাল, কোনও কিছুই জেনাই তোশানা দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয়। থাকেওনি। আমি শুধু দেখেছিলাম পাড়টির মোড়ে দাড়িয়ে বিনু আর শীতল তাকিয়ে আছে আমাদের দু'জনের দিকে।

আমি পরে ভেবেছিলাম ওটা কেন করতে গেলাম। তোশানা তো বলেই গিয়েছিল আমি মরে গেলেও আর আমার মুখ দেখবে না! তবে! তবে কেন আমি হঠাৎ এমন ছেলেমানুষী করতে গেলাম!

নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছিল আমার। ছেলেমানুষী ব্যাপারটা কোনওদিনই কি কাটিয়ে উঠতে পারব না? ভুলে গেলাম কী করে সেই সব কথাগুলো! আমি মনে-মনে ঠিক করেছিলাম আর কখনও এই ভুল করব না। তাই আজ সকালে যখন শীতল এসেছিল আমার ঘরে, আমি প্রথমটায় পান্ডা দিইনি। বলেছিলাম, 'আমায় এসব বলিস না শীতল। আমি কালই চলে যাচ্ছি। আর এসবে যেতে চাই না।'

শীতল বলেছিল, 'তুমি আমার কথাটা ধরো-বামুদা হুঁম! তুমি একবার আসল ব্যাপারটা দিগিকে বলো। দেখবে, ঠিক হয়ে যাবে সব।' 'ঠিক হয়ে যাবে? কী ঠিক হয়ে? আর কিছু নেই ঠিক হওয়ার,' আমার ভিতরে একটা বাঁধ উঠতে দাড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম, 'তোদের এখনও এইসব সিনেমাটিক ধান-বারুদসোলা গেল না?'

শীতল চোমারে বসে কথা বলছিল। আমার কথা শুনে উঠে দাড়িয়ে বলেছিল, 'তুমি জান না তাই বলছ! দিদি সিলি ল্যান্ড ইউ! সি নেভার স্টপড লাইভ ইউ! এমন কারো না রুকুদা। যা হয়েছে বড় ভুল হয়েছে! কিন্তু একটাটাই তো লাইফ টাইম! ভুলটাকে কেন ভ্রাগ করবে? তুমি সেদিন যেভাবে দিদির পিঠনে গিয়েছিল, আমি দেখছি। স্লিক্স, কথা হলো দিদির সঙ্গে। আচ্ছ!'

'আজ?' আমি অবাক হয়েছিলাম, 'কী বলব?'

'যা মনে হয়। তোমার সড়িটা। যেদিন দিদি শুনতে চায়নি। যার কষ্ট আজও ভোলেনি। দিদি আজ ফুলের পিকনিকে গিয়েছে। আসতে-আসতে অনেক রাত হবে। এই এগারোটা ধরো। তখন বোলে। ফাঁকা নির্ভনে কথা বোলে।'

'কী হবে কথা বল?' বুঝতে পারছিলাম যে, ভিতরে-ভিতরে দুর্বল হচ্ছি আমি। যে-বাঁধটা তৈরি হয়েছিল, মনে বুঝতে পারছিলাম সেটা আসলে মাটির তৈরি।

শীতল বলেছিল, 'আর যাই হোক তুমি ওখানে আর দিদি এখানে একটু মন স্থগিত করে বাঁচতে তো পারবে!'

আমি বড়রাস্তা থেকে আমাদের পাড়ার দিকে এগোলাম। শীতের রাত বোধহয় আরজ কলকাতার পথঘাট শুনশান হয়ে আছে। শুধু গোলা পাকানো পাঁচ-ছটা সেড়ি কুকুর, ফুটপাথে সর্বস্ব মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা দু'জন মানুষ, আর হঠাৎ চলে যাওয়া একটা পুলিশভ্যান ছাড়া আর কিছু নেই। সাণা ভেগার ল্যান্ডশপে আজ কেন যেন জ্বললো, আমার বোধহয় আজ কলকাতার রাতের আটকে থাকা কথা ঠিক হচ্ছে? ও যদি রাগ করে! কথাটা ভেবেই হাসি পেল আমার। যদি রাগ করে, করবে। এর চেয়ে আর কী খারাপ হবে? আর কি কিছু বাকি রয়েছে খারাপ হওয়ার। আমি নিজের মনেই হেসে ফেললাম। আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল কবির মুখ। গতকাল রাতের বেলায় কাকুর সামনেও এমনভাবেই হেসে ফেলেছিলাম আমি।

বাঁওয়ার খুব গতকাল রাতের ঠাকুরের কাছে যাব বলে তিনতলা থেকে নেমেছিলাম আমি। তখন কাকু ঘরেছিল আমায়। কাকুকে দেখে কোমল দ্রুতটা লেগেছিল আমার। মনে হয়েছিল মানুষটা ভাল নেই। কী? মনে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। বাস টানছে কষ্ট করে। বলেছিলাম, 'কী হয়েছে কাকু?'

কাকু তাকিয়েছিল আমার দিকে। গায়ের সোয়েটারটা ঠিক করে হাঁপিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, 'তুই এমন কলি রুকু! পূজাকে বিয়ে করলি না? বাড়িটাও বিক্রিতে রাকি হলি না। এখন আমার কী হবে বল তো?'

'কী হবে?' আমি তাকিয়েছিলাম কাকুর দিকে, 'পূজাকে আমি যেমন বিয়ে করিনি, পূজাও আমায় বিয়ে করতে চায়নি। ওর বয়স্ক্রান্ত আছে কাকু। রাসি আমি ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। ভাবো একবার! দশ-শটা বছর! ও ঠিক করেছে!'

কাকু বলেছিল, 'আর বাড়িটা? তুই থাকিস না এখানে। কেন আটকে রেখেছিস? আমার দুটো মেয়ে।' কী হবে ওদের? প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। কটা টাকা পাই? এভাবে আমি কী করব? বাজারে দেনাও আছে অনেক। দুটো মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তুই বল রুকু, এটা কী করলি তুই?'

আমার কষ্ট লেগেছিল কাকুকে দেখে। সেখিয়েছিলাম, বারান্দায় এসে দাড়িয়েছে কাকিমা। ঘরের পরশা সরিয়ে উঠি দিচ্ছে পাকু আর বিনু। কাকু ক্রান্ত চোখে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলেছিল, 'আমি যে আর টানতে পারছি না রুকু। সাধ করে কি বাড়ি বিক্রি করতে চাই? মায়ের সঙ্গে কি সাধ করে ঝগড়া করি? আমি কী করব? আমি কাকে বলব বল তো? তোকে দেখে ভরসা হয়েছিল। তুইও এমন কলি রুকু!'

আমি কাকুর হাত দুটো ধরেছিলাম। কষ্ট লাগছিল কাকুকে দেখে। আমার সঙ্গে ইচ্ছে করলে তো লোকটা ঝগড়াও করতে পারত। নিজের অসহায়তাটা তো না-ও বলতে পারত! কিন্তু কাকু তো করেনি।

আসলে কোমলদ্বিহী কাকু আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি! আমি বলেছিলাম, 'তুমি ভেবে না। আমি প্রতিমাসে তোমায় কিছু টাকা পাঠাব। হয়তো বেশি পারব না, কিন্তু দুশো ডলার মতো পাঠাব।'

'জ্যা?' আমার এমন প্রশ্নে কাকু কী বলবে বুঝতে পারিনি।

তাকিয়েছিল ফালফাল করে।

পরমা সরিয়ে এবার এগিয়ে এসেছিল বিলু। গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'না দাদাভাই, কিছু পাঠাবি না। আমি মাস্টার্স কমন্ট্রি করেই এসএসসি আর নেট দেব। আমি তো আছি। তুই কেন পাঠাবি?'

আমি বলেছিলাম, 'কারণ, তোরা আমার বোন। কাকু আমার কাকু। যতদিন না তুই চাকরি পাচ্ছিস ওটুকু পাঠাব। তারপর আর পাঠাব না। মানুষ রোজগার করে কি শুধু নিজের জন্য? রোজগার করে নিজেদের জন্য। তাই না?'

বিলু চশমা খুলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। তারপর ধরা গলায় বলেছিল, 'তা হলে দশ বছর আসিসনি কেন? তোরা একবারও মনে পড়েনি আমাদের কথা? কেন আসিসনি দাদাভাই, বল?'

আমি তাকিয়েছিলাম বিলুর দিকে। গোল ছোট্ট মুখ। ঘাড় অবধি কাটা চুল। ওর চোখের পাড়ায় টালটাল করছিল জল।

আমি বলেছিলাম, 'আমার ভুল হয়েছিল বিলু। সব ভুল রে!'

গলিটা অন্ধকার। ঠিক সেই রাতের মতো। চারপাশের বাড়িঘরের জানালা বন্ধ। তা-ও আবহাওয়াবে দেখা যাচ্ছে সব কিছু। আমি এক পাশে দাড়িলাম। ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা পাঁচ বাজে।

আচ্ছা, এই যে আমি গাড়িয়ে আছি, যদি তোশানা না আসে? যদি বড়রাস্তা দিয়ে ফেরে ও? যদি এমন হয় যে, আগেই ফিরে গিয়েছে? তবে? তবে কি আর বলা হবে না ওকে কথাগুলো? তবে কি আরও বহু-বহু বছর মনের মধ্যে এমন একটা অন্ধকার সিঁড়ি নিয়ে ঘুরতে হবে? অনিশ্চয় একটা জীবন নিয়ে রোজ তোরবেলা উঠে ভাবতে হবে, আজকের দিনটা আমি কেন বাঁচব? ভাঙাতোরা জীবনটাকে যতটা পেরেছি মেরামত করার চেষ্টা তো করলাম। কিন্তু এই একটা ক্ষত কি থেকেই যাবে? এখন আমার আর কিছু চাই না ওর কাছ থেকে। শুধু তোশানা আমার কথাটা শুনুক। শুধু সেই রাতের অন্ধকার সিঁড়িটা সরিয়ে নিক আমার জীবন থেকে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম গলির মাঝখানে। পাড়া নিরুমা। হিম পড়ছে। অথবা না চাঁপ বুলে রয়েছে গাছের ফাঁকে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। রাত বাড়ছে!

আর তখনই দেখলাম গলির ও মাথায় একটা ছায়া। 'কুকুর কি এল? আবহাওয়া কে ওটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। অন্ধকার রহস্যময়। অন্ধকার আবার লাজুকও। সে সহজে প্রকাশ করে না কিছু। আমি দেখলাম, ছায়াটা এগিয়ে এল আরও কাছে। আমিও এগোলাম। কিন্তু ছায়াটা অচেনা। কে এটা? হঠাৎ ছায়াটা থমকে গেল এবার। তবে সামান্য নড়াচড়া দেখে বুঝলাম, পকেট থেকে বের করল কিছু। তারপর আমকা ফট করে একটা শব্দ হল। আলোর লাল-হলুদ বালকানি বালসে উঠল অন্ধকারে। আর, কিছু বোঝার আগেই মনে হল কেউ একটা গরম লোহার শলাকা গাঁথে গিয়েছে আমার শরীরে। পেটের পাশ থেকে একটা যন্ত্রণা নিমেষে ছিটকে গেল সরাসরি। আমি পড়ে গেলাম মাটিতে।

ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে এসে বলল, 'বাক্সেত বাড়ি দিবি না? নে শালা, মর এখানে। মর। কেঁদে-ককিয়ে মর।'

ছেলোটা বন্ধুত্ব ভুলল আবার। আর ঠিক তখনই পিছনে একটা পায়ের শব্দ শুনলাম। শুনলাম মেয়েলি গলার চিংকার, 'কে ওখানে? এই কে? কে ওখানে?'

তোশানা! তবে এল শেষ পর্যন্ত। ছেলোটা আর গুলি চালাল না। বরং দৌড়ে পালাল এবার। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। পেটের যেখানটা চেপে ধরেছি, সেই জায়গাটা চটচট করছে। বুঝতে

পারছি রক্ত। আমি শূন্যে হাত বাড়লাম। জানি না কে এসে ধরবে আমার হাত, তবু বাড়িয়ে দিলাম।

'রক্ত? তুমি?' তোশানা এসে ধরল আমার হাতটা। উপড় হয়ে বসে পড়ল মাটিতে, 'রক্ত, রক্ত, তুমি কী করছিলে এখানে? এত রাত...কে মারল তোমায়? কেন? রক্ত...'

আমার হাতে তোশানার হাত। 'nobody, not even the rain, has such small hands.' আমার জিত জড়িয়ে আসছে। অবশ হয়ে আসছে মাথা। শরীরের ভিতর হাজার-হাজার কণ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের ভিতরে আমি নতুন অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি এখন। সেখতে পাচ্ছি সেই সিঁড়িটা। সকালবেলার সেই কথাগুলো এখনও যেন ভেসে-ভেসে আসছে। আমি তোশানার শরীর থেকে ভেসে আসা আমার চকিশ বছর বয়সটার গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এই কি সেই সুযোগ? জীবন কি সুযোগ দেয় আমাদের? প্রিয় মানুষের কাছে ফিরে আসার, প্রিয় মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার বা অন্ধকার ঘরের সমস্ত আলোগুলো আবার এক-এক করে জ্বালানোর সুযোগ কি দেয় জীবন? আমাদের ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া সেই রাস্তাগুলো, আমাদের কিশোরবেলার সেই সব বিকেল আর মনখারাপগুলো বা সত্য যুবক হয়ে ওঠার শূন্য পাজিরগুলো কাছের জীবন অন্তত একবার ফিরে যেতে দেয় কি আমাদের? সে কি বলে, শেষ হওয়ার আগে আর-একবার তুমি জ্বলে ওঠো! জ্বল শুকিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো গাঁথে নাও মালা? বলে কি, সেই বৃষ্টির ভিতর এই অস্তিমবার তুমি ভিজে নাও তার সঙ্গে? জীবন, তুমি কি সুযোগ দাও? ডাক্তা, অবিশ্বাসী আর নিকিতভাবে খণাখণক পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর শেষ সুযোগ কি দাও তুমি? সব খারাপ লাগা ভুলে তুমি কি আমাদের সামনে এমন দাও ভোরবাতের স্বপ্নটুকু? তাকে না বলা সেই কথাটা বলার সুযোগ কি তুমি শেষবারের মতো ফিরিয়ে দাও? তুমি কি হারিয়ে যাওয়া সেই আর্মিট-সঙ্গে আবার দেখা করিয়ে দাও আমাদের?

'রক্ত, রক্ত, তোশানা হাত ধর খাঁকছে আমার। চিংকার করে আশপাশের বাড়ির লোকদের ডাকছে। মোবাইল বের করে কাকে যেন ফোন করছে। কান্দে যেন আসতে বলছে এখানে। তোশানা কান্দছে। ওর কথা ভুলে যাচ্ছে জলে। জলে মিশে যাচ্ছে রক্ত। রক্ত ধীরে-ধীরে অবশ করে দিচ্ছে আমায়।

'রক্ত, তাকাও রক্ত। কী বলবে বলো। আজ বলো। কোনওদিন যা বলোনি আজ বলো রক্ত, তোশানা যুঁকে আছে আমার উপর।

আর আমি ধীরে-ধীরে ভুলে যাচ্ছি অন্ধকারে। বহু বছরের জমা ঘুম এসে ঘিরে ধরছে আমায়। আজ আর কোথাও যাওয়ার নেই। কিছু হারানোর নেই। শুধু চরাচর জুড়ে এখন পিশারমিষ্টের তুষারপাত শুকু হয়েছে। নরম বরফ ঢেকে দিচ্ছে আমার শরীর।

'রক্ত, তোশানা শেষবারের মতো প্রচণ্ড জোরে কাঁকানি দিল আমায়। আর ঠিক তখনই ঘুম ভুলে যেতে-যেতে আবহা কোনও মেঘের ওপারে যেন শুনলাম কিছু। গলির একদম শেষ প্রান্ত থেকে ভেসে এল অন্ধুত এক পরিচিত শব্দ। 'টিউ টিউ!'

সাইকেলে লাগানো এয়োমেনের হর্ন!

আমি চোখ বুললাম।

(গল্পটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কেবল পিশারমিষ্টের তুষারপাতটুকু সত্যি! আঙও!)

অঙ্কন: অমিতাভ চন্দ্র

